

Nature Treatment

Without Medicine and Operation.

Durgesnath Bhattacharjya

Sayedabad, Khagra P. O. Murshidabad

প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

বিনা ঔষধে ও বিনা অস্ত্রাঘাতে সহজ ও কঠিন সকল রোগের চিকিৎসা।

প্রণেতা ও প্রকাশক—

শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য।

সৈদাবাদ, খাগড়া পোষ্ট, মুর্শিদাবাদ।

তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৩৫। আশ্বিন

প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

শ্রীদুর্গেশনাথ ভট্টাচার্য্য।

সৈদাবাদ, খাগড়া পোঃ, মুর্শিদাবাদ।

বহরমপুর, সত্যরত্ন যন্ত্রে

শ্রীললিতমোহন চৌধুরী প্রিণ্টার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য মায় ডাকমাশুল—বার আনা মাত্র।

আত্ম-বিবরণ।

মাকসার জালে মাতঙ্গ বেঁধেছে। যে লোক পদব্রজে হাজার মাইল ভারতের পশ্চিম, দক্ষিণ, পূর্ব্বে হাঁটিয়াছে, যে লো রেল, ষ্টিমারে নানা স্থানে গিয়াছে, আজ সে কাল ব্যাধিতে আক্র হইয়া, রোগ-শয্যা আলিঙ্গন করিয়াছে। গত বৎসর ১৭ই বৈশ শ্রীবৃন্দাবনধামে পরিবার রজঃ প্রাপ্তা হইয়াছেন। তারপর E.I B.N.W., E.I., B.B.C.I., B.N. প্রভৃতি রেলে পরিভ্র কালে, এই কাল ব্যাধির উদ্ভব। মোপলাদের গাড়ির মত গা পশ্চিমায় বোঝাই, তার উপর নিষ্ঠিবণপূর্ণ মোসাফিরখানা, য রোগের আঁতুর ঘর। আমার 'জীওন কাঠি' তাঁহার হস্তে ছি তাই মরণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। তাঁহার নিকট আম অমুদ্রিত প্রাকৃতিক চিকিৎসার ও দেশ ভ্রমণের Mss. থাকি যদি জীবন পাই, প্রাকৃতিক চিকিৎসার উত্তর ভাগ শারদীয়া পূজ পর মুদ্রিত হইবে। উহা পাশ্চাত্যের অনুবৃত্তি হইবে না, আ ঋষিগণের পদাঙ্ক স্মরণ করিয়া এবং আত্ম জ্ঞানে লিখিত হইবে অলমতি বিস্তরেণ—১৩৩৫। ২১শে আশ্বিন।

খাদ্যা: ্য।

ব্যাধিগ্রস্তের একরূপ খাদ্য, সাধারণের অন্যরূপ। ব্যাধিত দ্রব্য, যথাসম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরে ধীরে ও অল্প মাণে খাইবে। যে খাদ্য আমরা খাইয়া থাকি, উহার র্ত্তন না করিয়া, শুধু খাদ্যের দ্বারাই সকল ব্যাধি আরোগ্য তে পারা যায়। জিহ্বা বড়ই প্রবল অশ্ব, ইহার বন্ধন ঠিক জীবনের একটা সময় আসে, ন মনটা শুধু, ইহা খাই, উহা খাই করে। ছিন্নমস্তার মত, জর গলা কাটিয়া, নিজের রক্ত পান করার, এই সময়। ইহা ভাবিক ক্ষুধা নহে, ইহা ব্যাধির ক্ষুধা। মরীচিকার মত, একটা ার ভাব, আমাদের মনকে ভ্রান্ত করে। ঐ ক্ষুধা খাইবার া, আমাদিগকে ত্বরিত তাড়না করে, কিন্তু মনঃসন্তোষ করিয়া ইতে পারি না ও এরূপ খাওয়ার পর ব্যাধি দেখা দেয়।

সকালে চা পান করা অভ্যাস থাকিলে, তাহা ছাড়িতে বে। প্রকৃতি সকাল ও বিকালকে স্নিগ্ধ করিয়াছেন, তবে খাইয়া ঐ সময় দুইটাকে গরম করা কেন? চা একটা াবিশের, সময় বহিয়া গেলে, কিম্বা না খাইলে, গরম কম লে, চা বেশী, কি কম হইলে, কেমন বোধ হয়; এইরূপ হওয়া ার ধর্ম্ম। Tetoteller (এককালীন নেশাবর্জ্জনবাদী)

মহোদয়দিগের মনোযোগ এ বিষয়ে ন্যস্ত করিতে অনুরোধ করি। রোগীর হাত ও পা, ঠাণ্ডার সময় অত ঠাণ্ডা বোধ হয়, তাহার কারণ, শরীরের সমস্ত গরম আসিয়া পেটে জড় হয়. ঐ পেটের গরম যাহাতে সমস্ত শরীরে ছড়াইতে, হাত পা গরম হইতে পারে তাহাই করুন। গরম পেটে আবার গরম চা দেওয়া কেন? চাকে অনেকে পাঁচন ভাবিয়া 'ঔষধার্থে' পান করিয়া থাকেন, পাচন পাকের একটা নিয়ম (recipe) আছে, কিন্তু এদেশে যে নিয়মে চা তৈয়ার করা হয়, তাহার সহিত পাঁচন পাকের নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। আহার প্রবেশের দ্বারে (মুখে), প্রকৃতি কেবলি প্রহরী (দাঁতের সারি) সাজাইয়া রাখিয়াছেন, ইহা দেখিয়া বেশ অনুমান করা যায় যে, ঐ পথে আহারীয় যাহা যাইবে, তাহা দন্তের বিষয়ীভূত হওয়া চাই, অর্থাৎ যাহা চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া যায়, এমন হইবে। আপনারা সদাই দন্তকে মোসহারা দিবার জন্য ব্যাকুল হন, কেবলি তর জলীয় খাদ্য খাইয়া থাকেন, সেই জন্য অকালে দন্তগণ কালগ্র পতিত হয়। চর্ব্বণ করিয়া খাইলে দাঁত অনেক দিন স্থায়ী আমাদিগের দাঁত, এমন নাজুব যে, একটা অম্ল ফল খাই স্থবির হয়। আর চিবাইতে পারে না। তরল খাদ্যে যেমন দরকার নাই, শরীরেরও তেমনি দরকার কম, চা কেন, সমস্ত পানকেই এ হিসাবে আমরা কমাইতে বলি, তৃ সময়, রৌদ্র বাতাস লাগে, এমন জল (নদী, পুকুর কি কূপের পান করিয়া পিপাসার শান্তি করিবেন

সকালের জল খাইবার সময় (Break-fast), সময়ের-সদ্যঃফল, মুগ কিম্বা বুট ভিজা, দেশী চিনি কিংবা গুড় দিয়া খাইবেন। 'সময়ের সদ্যঃ' কথা দুইটা একটু বুঝুন। সময়ের অর্থাৎ বৈশাখ মাসে তরমুজ খরমুজ, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে আম কাঁঠাল ইত্যাদি, সদ্যঃ অর্থাৎ খাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে গাছ হইতে পাড়া, ঘরে রাখা কিম্বা বিদেশ হইতে আমদানী করা নহে। ফলে স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক বল হয়। আপনারা যদি ফল আহার করেন, তবে দেখিবেন, প্রকৃতি আপনাদের জন্য ৩৬৫ দিনে কত প্রকার অমৃত ফল প্রসব করিয়া আপনাদের পরিতোষ সাধন করিতেছেন। আমাদিগের ফলাহারী পূর্ব্বপুরুষগণ কত দীর্ঘায়ুঃ ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতের উন্নততম স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন। তবে দুর্ব্বল হইবেন, লেখা-পড়া কাজ-কর্ম্ম হইবে না বলিয়া এত ভয় পান কেন? কাল্পনিক (Theoretical) জগত ছাড়িয়া বাস্তব (Practical) জগতে আসুন, দেখা যাউক, কিসে কি হয়, আর কিসে কি না হয়। সহরবাসীদিগের সদ্যঃ ফল পাওয়ার সুযোগ কম; অগত্যা তাঁহা-দিগকে বিদেশ ও পল্লী হইতে আমদানী ফলে জলযোগ সমাপন হইবে। দেশজ ফল না পাইলে, কিম্বা পথ চলিতে খসা (strewed) ফল খাওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্বে 'দেশী' একটা শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। দেশী চিনি আক তৈয়ার হয়, আক, স্বভাবতঃ খাদ্য বস্তু, আর বিট প্রভৃতি বিলাতি চিনি হয়, বিট খাদ্যের অনুপযোগী। যাহা

স্বাভাবিক (প্রাথমিক) অবস্থায় খাওয়া যায়, তাহার বিকৃতি খাওয়া যাইতে পারে, ইহাই নিয়ম। বিটে যেমন চিনিভাগ পাওয়া যায়, অমন চিনিভাগ অনেক বস্তুতে আছে। আপনি কি তাহা খাইতে পারেন? আর আমদানী জিনিস সত্বঃ হয় না, যে জিনিস যত সময় অতিক্রম করে, সে জিনিস তত গুরুপাক হয়, অর্থাৎ পেট গরম করে।

আপনারা যে জলযোগের কার্য্যটি সর্ব্বতোভাবে ময়রার উপর বরাত দিয়া রাখিয়াছেন, উহা ভাল নহে। নিজের ক্ষুধা পাইলে, কিম্বা কুটুম্ব আসিলে, পয়সা লইয়া দৌড়ান, উহা কি ভাল? খাবার কিনেন, না ব্যাধি কিনেন? বাজারের বার আনা 'খাবার' আপনাদের দৈনন্দিন আয় খাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। গোয়ালার জিনিষ ও কাঁচা সন্দেশ অনেকাংশে ভাল হইতে পারে, কিন্তু পক্কান্ন খাইবার সময় বিশেষ সাবধান হইবেন। পূর্ব্বে চিনি সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছি, ময়দা ও ঘৃত ও নিওার সম্বন্ধে আর কয়েকটী কথা লিখিতেছি। চিনি সম্বন্ধে যে কথা, ময়দার সম্বন্ধেও সেই কথা। ময়রারা যে ময়দা সাধারণতঃ ব্যবহার করে, উহা কলের, কলে অনেক স্থানে গম ব্যতীত অন্য অখাদ্য বীজ ভেজাল করিয়া ময়দা প্রস্তুত করা হয়। আর কলে ময়দা ঠিক জাঁতার ন্যায় পিষিয়া গুঁড়া করা হয় না, অন্য রকমে গুঁড়া করা হয়, বিলাতের পণ্ডিতেরাও কলে প্রস্তুত ময়দার পক্ষপাতী নহেন, তাঁহারাও জাঁতায় পেষা ময়দার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ঘৃত দেব-ভোগ্য জিনিষ, কিন্তু সময়ে

সময়ে পথ চলিতে ময়রার দোকানে যে ঘৃতের গন্ধ পাওয়া যায়, সেরূপ গন্ধ নিম্‌তলা ঘাট দিয়া যাইতে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। বাজারের অবস্থা এমন যে, যে সকল ঘৃত সাধারণতঃ বিক্রীত হয়, তাহাতে হয় বাদাম কি মৌয়া ইত্যাদির তেল ভেজাল আছে, নয়ত চর্ব্বি আছে। ঘ্রাণে, আস্বাদনে ভাল গো মহিষের ঘৃত কয়টি দোকানে পাওয়া যায়? আর যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে গৃহস্থের ঘর চলিতে পারে, কিন্তু দোকান চলিতে পারে না। খাঁটি জিনিস যদি কোন দোকানদার রাখিল, তখন আপনারা দরিদ্র হইলেন, অত চড়া দর দিতে পারিলেন না। কেন, রোজ খাবার খান, এক দিন বাদ এক দিন খান না? খাবার না খাইলে মানুষ মরে না। নিঙার বলিয়া পূর্ব্বে একটী শব্দ লিখিয়াছি, নিঙার অর্থাৎ শেষ, আজ এক মণ ঘৃত পোড়াইয়া এক সের থাকিল, আবার কাল ঐ সেরে আর এক মণ দিয়া কাজ করার পর, মনে করুন, দুই সের থাকিল, আবার ঐ দুই সেরে ঘৃত যোগ হইয়া খরচ হওয়ার পর, খানিক ঘৃত অবশিষ্ট অর্থাৎ নিঙার থাকিল। এইরূপে নিত্য নূতন ঘৃত নিঙারের সহিত যোগ হইয়া রামনবমীর নিঙার দুর্গোৎসবের মহানবমীতে আসিয়া ঠেকে। হোমিওপ্যাথিক মতে কহিতে গেলে, কহিতে হয়, আদত জিনিসের (mother tincture) ২০০ শত ডাইলিউসন হইয়াছে! হোমিওপ্যাথি বীজ (নিঙার) শক্তির গুণ জানেন শুধু, কিন্তু আমরা ঐ বীজ শক্তির দোষ সম্পূর্ণ অবগত আছি; বিজ্ঞান জানেন না বলিয়া,

আপনারা নিভারকে অবহেলা করিবেন না, নিভার হইতে সাবধান হইবেন, আইন জানে না বলিয়া দোষী কবে শাস্তি হইতে অব্যাহতি পায় ? আপনাদের ঘরে এক দিনের খাবার দ্বিতীয় দিন বাসী হয়, অর্থাৎ না খাইবার মত হয়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ময়রারা তাহাদের দোকানের খাবার বাসী বলিয়া ফেলিয়া কিম্বা আলাদা রাখিয়া দেয় কি ? তাহাদের কড়াই মাজিতে দেখিয়াছেন কি ? নিভার দোষ ঘৃতে যেমন হয়, সেইরূপ সেরা প্রভৃতিতেও হইয়া থাকে। আপনারা চা খাবার সময় ইংরাজের অনুকরণ করেন, কিন্তু খাবার খাইবার বিষয়ে করেন না, এইটি বড়ই দুঃখের কথা। গৃহস্থের হাঁড়ি, কড়া প্রভৃতি নিত্য মাজা কিম্বা বদলান চলিতে পারে না, সেই জন্য হেঁসেলের সৃষ্টি। যেমন দেবতাকে হেঁসেলের জিনিষ দেওয়া হয় না, ঐরূপ রোগীকে হেঁসেলের তৈয়ার খাদ্য দেওয়া উচিত নয়।

চা'ল, দা'ল, শাক, তরকারী, মাছ, দুধ, এই সকল দেশের প্রধান খাদ্য, ধনী গরীবের ইহাই প্রধান আহার, ইহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক। ধান হইতে চাউলকে বিভিন্ন করিলে, উহার জননী শক্তি অর্থাৎ পুনরায় ধান গাছ সৃজনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়, দালেরও খোসা ছাড়াইলে ঐরূপ জননী শক্তি নষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া চাউল কি দাইলের প্রাণ এককালীন বিনষ্ট হয় না, ঐ সকল প্রাণময় খাদ্যের আহারে, আমরা নিত্য নূতন প্রাণে উজ্জীবিত হই। একটা চাউলের আজ যেটুকু প্রাণ (শক্তি) আছে, কাল উহা হইতে কমিয়া

যাইবে, পরন্তু আরও কমিবে, ইত্যাদি। বৃদ্ধের জীবনী শক্তি যেমন নিত্য কমিয়া যায় ও জগতের জন্য ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। এইরূপ সমস্ত আহারীয় সামগ্রীই, শুধু চাউল কেন, প্রকৃত আহারের সময়ের পর ক্রমশঃ অপ্রয়োজনীয় অর্থাৎ গুরুপাক হয়। অগ্নি দ্বারা যেমন পাক হয়, কালের দ্বারাও ঐরূপ পাক হইয়া থাকে, কালও প্রত্যেক বস্তুকে লইয়া প্রতিক্ষণে ক্রিয়া করিতেছেন, নূতনকে পুরাতন করিতেছেন, কাল চুলকে পাকাইতেছেন। আজ নবান্নের চাউলে অগ্রহায়ণ মাসে যেটুকু প্রাণ পাইবেন। আগামী বর্ষে কার্ত্তিক মাসে জানিবেন, সে প্রাণটুকু কমিয়া গিয়াছে, চাউল বৃদ্ধ, কিঞ্চিৎ গুরুপাক হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে আমরা এখনকার চাউলকে লঘুপাক ও এক বৎসর পরের চাউলকে গুরুপাক বলিতেছি: এখনকার চাউলকে শরীরের পক্ষে উপকারী ও লঘুপাক এবং এক বৎসর পরের চাউলকে শরীরের পক্ষে কম উপকারী ও গুরুপাক বলিতেছি। নূতন চাউল পরিমাণে কম খাইতে হইবে। কিন্তু জগতে আপনারা ইহার বিপরীত শুনিতে পাইয়া থাকেন। কবিরাজ মহাশয়েরা এবং ডাক্তার বাবুরা কত বৎসরের কীটোচ্ছিষ্ট চাউল রোগীর জন্য ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, খাদ্য যখনই মানুষের খাইবার অযোগ্য হয়, অমনি প্রকৃতি উহা কীট দ্বারা খাওয়াইতে আরম্ভ করেন। নূতন চাউলে প্রাণ বেশী, তজ্জন্য ইহার ক্রিয়া-শক্তি বেশী, পুরাতন চাউলের প্রাণ কম, তজ্জন্য ক্ষমতাবিহীন। নূতন চাউল

পেটে গিয়া শরীরের আবদ্ধ মলকে বাহির করিয়া দেয়, কিম্বা দিবার চেষ্টা করে। পুরাতন চাউলের সে ক্ষমতা কোথায়? উহা মলকে ঘাঁটায় না, উপরন্তু নিজে মল হইয়া শরীরে বসিয়া থাকে। এই মলকে বাহির করিয়া দিবার জন্য ডাক্তারেরা জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তবে দাস্ত হওয়ায় ভয় পান কেন?—যদিও দেশে 'মল ভাণ্ডং ন চালয়েৎ' ব্যবস্থা চির-প্রচলিত। জোলাপের বাহ্য, উহা ভেল্কি বিশেষ, উহাতে শরীরের সকল প্রকার মল বাহির করিতে পারে না, জোলাপের পর হইতে আবার কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে আরম্ভ হয়, তখন আবার জোলাপ চাই। চিরদিন যদি জোলাপ লইয়া বাহ্য করিলেন, সে ত জোলাপে বাহ্য করিল, আপনি কি করিলেন? আপনি নিজে স্বাভাবিক বাহ্য যাইবার চেষ্টা করুন। জোলাপের বাহ্যে সন্তুষ্ট হওয়া, আর পরের মল দেখিয়া সন্তুষ্ট হওয়া প্রায় একই কথা।

জীব-জগতে মনুষ্যের ইহাই প্রধান বিশেষত্ব যে, তাহারা পাক করিয়া খায়। পাক সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে। লঘুপাক খাদ্য খাইতে হইবে, গুরুপাক খাদ্য সাধ্যমত বাদ দিতে হইবে। লঘুপাক, অর্থাৎ অগ্নির জ্বাল কম সময় হইলে লঘুপাক হয়, আর বেশী সময় জ্বাল হইলে গুরুপাক। লঘুপাকে আগুনের আঁচ কম হইবে এবং জ্বাল ধীরে ধীরে হইবে, কাঠের জ্বাল লঘুপাক। কয়লার জ্বাল গুরুপাক, কারণ উহাতে আঁচ কড়া হয় এবং বড় তাড়াতাড়ি পাক হয়। প্রকৃতি কয়লাকে বাহ্য

জগতের অন্তরালে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু কৌশলী মানব ঐ মেদিনী গর্ভের ময়লাগুলাকে টানিয়া বাহির করিতেছে; উহার যেমন রং, আর পোড়াইলে তেমনি কু এবং তীক্ষ্ণ গন্ধ ছাড়ে। (উষ্ণ) উষ্ণা চাউল লঘুপাক নহে, গুরুপাক; কারণ একবার ধান সিদ্ধ করিয়া উহাকে তৈয়ার করা হয়, দ্বিতীয়বার রাঁধিয়া খাওয়া হয়। নূতন পুরাতন লইয়া পূর্ব্বে যেমন আমাদের সহিত দেশ-প্রচলিত মতের বৈপরীত্য দেখাইয়াছি, বেশী ও কম জ্বালেও ঐরূপ মত বৈপরীত্য আছে। এক কথায় বলিয়া রাখি যে, যতই পাক করা যাইবে, ততই সেই জিনিষের জীবনী-শক্তি হ্রাস হইবে। অসার, কম জীবনী শক্তি বিশিষ্ট জিনিষ, যদিও বেশী মাত্রায় খাওয়া যায়, কিন্তু উহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। পাকের সময়, ঘাঁটিলে পাক দ্রব্য গুরুপাক হয়। আঘাঁটা সকালের তরকারী বৈকালে চলে, কিন্তু ঘাঁটা তরকারী বৈকালে গন্ধ ও অম্ল হইয়া যায়। যাহা হউক, স্থির মনে আহার করিবেন, কোন চিন্তা কি গল্প ঐ সময়ে করিবেন না। আপনার মুখ দিয়া ভগবান খাইতেছেন, এইটী যেন মনে রাখিবেন, আর ভগবানকে খাওয়াইতে পারেন, এইরূপ জিনিষ খাইবেন। খাইবার সময় খাদ্য বস্তুকে ধীরে ধীরে ও সম্পূর্ণরূপে চর্ব্বণ করিয়া গলাধঃকরণ করিবেন। আধিক্য দোষ মনোযোগ পূর্ব্বক বর্জ্জন করিবেন। আধিক্য দোষ বলিতে বেশী লবণ, কি ঝাল, কি মিষ্ট, কি তিক্ত ইত্যাদি, কিম্বা পরিমাণে বেশী বুঝিতে হইবে। মঙ্গলামঙ্গল জিজ্ঞাসা করায়, এক ব্যক্তি উত্তর

দিয়াছিলেন, "হোটেলে আহার ধরা অবধি আছি ভাল।" সে কি? কারণ হোটেলওয়ালারা তেল, মস্‌লা খাদ্যের পরিমাণ সবই কিছু কম করে। ইহাতেই ব্যাপার বুঝুন। ক্ষুধা পাইলে খাইবেন, খাবার প্রস্তুত হইলেই যে খাইতে হইবে, ইহা কোন কথা নহে। কম খাইবেন, কিন্তু লোভে কি অনুরোধে বেশী খাইবেন না! পরিমাণ মত খাওয়া হইলেই, প্রণিধান করিয়া দেখিবেন, কে যেন ভিতর হইতে বলে "হইয়াছে, আর না"। আমাদের মতে, যেরূপ পাক-প্রণালী আদর্শ হওয়া উচিত, তাহাই নিম্নে লেখা যাইতেছে। কার্য্যতঃ পরীক্ষা করিলে, ইহার গুণ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অন্ন। হাঁড়ীতে এমতভাবে চাউল ও জল দিবেন যে, ঐ জলে চাউল ৸৶০ আনা সিদ্ধ হয়। ৶০ আনা শক্ত থাকিতে হাঁড়ী উনুন হইতে নামাইয়া সরা দিয়া ঢাকিয়া দিবেন। কিছু সময়ের পর দেখিবেন, চাউল ভাপে সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। ফেন গালিবার দরকার হইবে না, ফেনের সহিত অন্নের সার-ভাগ চলিয়া যায়। ফেন-গালা ভাত, বিনা তরকারীতে খাওয়া যায় না, কিন্তু ফেনযুক্ত অন্নে স্বাভাবিক মিষ্ট স্বাদ আছে। চাউল আতপের হওয়া দরকার এবং সকালে চাউলে জল দিয়া ভিজাইয়া রাখিলে, চাউল কিছু আপনা হইতেই নরম হয়। আমাদের হেঁসেলের ভাত-তরকারীর হাঁড়ী মাতান জিনিষ। রোগীকে নিত্য নূতন হাঁড়ীতে রাঁধিয়া দেওয়া উচিত, এবং সুস্থলোকের উচিত, বযুনাতে রাঁধিয়া খাওয়া ও নিত্য মাজান।

অবশ্য এত গোলযোগ প্রায় লোকেরই ভাল লাগিবে না! খুব রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে, যদি তাহারা ভাত-দাল-তরকারী খাইবার আব্দার করে, তবে তাহাদিগকে উত্তপ্ত জলের উপর হাঁড়ী চাড়িয়া দিয়া, এ সকল পথ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

দাইল। ভাজা মুগ ও কলায়ের দাল রাঁধা দেশের নিয়ম, কিন্তু আমাদের হিসাব অনুসারে, দেখিবেন, ইহা গুরুপাক; সব দাইলই আমরা কাঁচা খাইতে কহি। যে দাল যে দিন খাইবেন, তাহা সেই দিন সকালে কিম্বা পূর্ব্ব দিন রাত্রে, জলে ভিজাইয়া রাখিবেন, জলটুকু যেন দালে শুষিয়া লয়, ফেলিতে না হয়। এরূপ করাতে দাল নরম হয়, অল্প জ্বালেই সিদ্ধ হয়। আমাদের গৃহিণীরা দাল চরাইয়া দিয়া সংসারের অর্দ্ধেক কাজ সারেন, ইহাতে দালে কেবলি জ্বাল পাইয়া গুরুপাক হয়। আর দালে যেন জল কম করেন। অনেকে দালের ঝোলেরই প্রিয়; কেহ দাল চিপিয়া ফেলিয়া দিয়া ঝোলটুকুই গ্রহণ করেন। এ সকল আমরা অনুমোদন করি না। ঝোলে দালে খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধির সহায়তা করে।

শাক-তরকারী।—সিদ্ধ মাখিয়া খাইতে আপনাদের নাসিকা তেলের গন্ধ পায়, কারণ তখন কাঁচা তেল খান, ভাজা কি সম্ভারের পর তত পান না। প্রায় কলের তেলই ভাল নহে, কারণ উহাতে সরিষা ছাড়া অন্য অখাদ্য বীজ মিশাল করা হয়, অখাদ্য বীজ হইতে যে তেল হয়, তাহা মোটা হয়, আর কলের তেলের লোহার পাত্রের একটা বদ রং ও দুর্গন্ধ হয়; ভাল তেল

ভাতের সহিত খাওয়া যায়; তজ্জন্য বাজার দেখিয়া তেল কিনিবেন। আগে তেলে ভাজিয়া, পরে জলে সিদ্ধ করিয়া শাক-তরকারী রান্ধা হয়, কিন্তু আমরা উহার বিপরীত করিতে বলিতেছি। শাক-তরকারীর ভিতর জল-ভাগ আছে, তজ্জন্য শাক-তরকারী নিজের জলেই নিজে কতকটা সিদ্ধ হইতে পারে, কেবল বাঁকি সিদ্ধটুকু হওয়ার মত জল মিশাইবেন, জল তরকারী ঢাকিয়া দিবেন, তরকারীও সিদ্ধ হইবে, জলও শুখাইয়া আসিবে, ঝোল গামাখা হইবে। যখন শাক-তরকারী ৺০ আনা সিদ্ধ হইবে, তখন মশ্‌লা, লবণ, তেল, ঘি ইত্যাদি দিবেন। উহা করিলে ঐ সকল জিনিষের স্বাদ ও ঘ্রাণ পাওয়া যাইবে। মশ্‌লা জিনিষটা প্রায়শঃই গুরুপাক (Fermented) কারণ উহাকে হয় জলে সিদ্ধ করিয়া, নয় রৌদ্রে শুকাইয়া রাখা হয়। এ জন্য মশলা কম পরিমাণে ব্যবহার করিতে বলি। কাঁচা মশ্‌লা কত সুঘ্রাণ ও সুস্বাদ, কাঁচা ও শুখ্‌না মরিচের তুলনায় বিচার করিবেন। অনেক মশ্‌লাই কাঁচা পাইবার উপায় নাই, কারণ দেশে জন্মে না।

ভাজা, চরচরি, বড়া ইত্যাদিতেও আগুনের অধিক তাপ লাগে, তজ্জন্য কম খাওয়া উচিৎ। বড়িও গুরুপাক। হিং পিঁয়াজ প্রভৃতির ঘ্রাণ সুঘ্রাণ নহে। অম্লকে অনেকে বিদ্রূপ করিয়া বলেন, কলির জীবন্ত দেবতা, কারণ দর্শনেই মুখে জল আসে। অম্ল সেবনে কোষ্ঠ পরিস্কার হইতে পারে; এই জন্য কোষ্ঠবদ্ধ হইলে রোগীকে অম্ল ফলের ব্যবস্থা করা যায়। শীত

কালেই নানারূপ অম্ল ফল পাওয়া যায়। রাঢ়দেশবাসিগণ অম্লের মাহাত্ম্য বিশেষ বুঝেন।

মাছ-দুধ।—ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশেই, সম্ভবতঃ মাছের, বেশী প্রচলন, মাছ না খাইলে অধিকাংশ বাঙ্গালীরই খাওয়া হয় না। ভারতবর্ষের পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশের লোকেরা মাছকে বড় ঘৃণার চক্ষে দেখে। দাক্ষিণাত্যে মিউনিসিপালিটির বাজার ব্যতীত, অন্য কোন বাজারে মাছ প্রবেশ করিতে পায় না। এ সকল কারণে, মাছ, খাদ্য কি অখাদ্য তাহার বিচার দরকার। আমরা মোটা কথায় এই বুঝি, যাহা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যায়, তাহাই পাক করিয়া খাওয়া যাইতে পারে। এ অবস্থায় মাছ অখাদ্য, কারণ কাঁচা মাছের আঁসটে গন্ধে সকলেই বিরক্ত হন। কিন্তু বড়ই ক্ষোভের বিষয়, অনেকে মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য মৎস্যের ঘ্রাণ লইতে বলেন। মৎসভুক্ বাঙ্গালী ও নিরামিষভোজী হিন্দুস্থানীতে শারীরিক বলের অনেক তারতম্য। দেহের দৈর্ঘে প্রস্থে বাঙ্গালী নিতান্ত কলির জীব! মাছের লালসা লোকের যেরূপ এবং বহুদিন হইতে মৎস্য ভক্ষণ প্রথা এদেশে যেরূপ প্রচলিত, তাহাতে এ ক্ষেত্রে আমি নিষেধ করিলে, খুব কম লোকেই সে নিষেধ শুনিবে। মৎস্য কম পরিমাণ এবং বারে কম খাওয়া যাইতে পারে। মৎস্যে ক্ষুধা নষ্ট করে ও শরীর ভার করে, ইহা পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে। শাস্ত্রকারেরাও মৎস্য-মাংস খাইতে কোন কোন সময়ে ও বারে নিষেধ করিয়াছেন এবং দেবতা ও পিতৃলোকের উদ্দেশ করিয়া

খাইতে বলিয়াছেন। মাছের বিষয় মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহাই সকলের নিকট মান্য হইতে পারে। "যে, যে জীবের মাংস খায়, তাহাকে তাহার মাংস-ভোজী বলে, যেমন বিড়াল মূষিক-মাংস-ভোজী। কিন্তু মৎস্য-ভোজীকে সর্ব্বমাংস-ভোজী বলে, এক মাছ খাইয়া সকল মাংস-ভোজী হওয়া বিষম পাপ, অতএব ইহা পরিত্যাগ করিবে"। তৎপরবর্ত্তী বিধানকর্ত্তাগণের ব্যবস্থা সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে, তাহাতেও বুঝা যাইবে, এ প্রকার দুবেলা সকল প্রকার মৎস্য ভক্ষণ, তাঁহাদের অভিপ্রেত ছিল না।

পূর্ব্বে ছাগ মাংসই এ দেশের হিন্দুদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাও দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া ৯ মাসে ৬ মাসে খাওয়া হইত। কিন্তু আজকাল মুসলমান ও ইংরেজদিগের সাহচর্য্যে আমরা রীতিমত মাংস-ভোজী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিয়াছি। সম্প্রতি যক্ষ্মা রোগের কারণ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতে যে সকল আলোচনা হইতেছে, তাহারই ফলাফল লইয়া ছাগ-মাংস, কুক্কুটমাংস এবং গোমাংসের ইতর বিশেষ দেখান হইতেছে। ছাগের ও মেষের যক্ষ্মা খুব কম হয়। ইহার কারণ, ইহারা স্বচ্ছন্দবনজাতভোজী। ইহাদের মাংস-ভোজী মনুষ্যেরও এই জন্য যক্ষ্মা রোগ কম হয়। কিন্তু কুক্কুট ও গো-জাতির মধ্যে যক্ষ্মা রোগ বেশী হয়, এজন্য মুরগখাদক ও গোখাদকের অনেকের যক্ষ্মা হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ কুক্কুট যথেষ্ট কদাহার করিয়া থাকে, গরুর মালিকের

দোষে গরুকে অনেক সময়ে মন্দ দ্রব্য আহার করিতে হয়। কুক্কুট ও গরুর মাংস এবং গরুর দুগ্ধ বিষাক্ত হওয়ার কারণই হইতেছে, উহাদের অখাদ্য খাওয়া। হাঁসপাতালের অভিজ্ঞতার ফলে কলিকাতার কোন সরকারী ডাক্তারের অভিমত যে, হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের যক্ষ্মা রোগ অধিক হয়। ইহা জাতিগত কারণ নহে, পূর্ব্বোক্ত খাদ্যগত কারণ। খাশীকে অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া করিয়া রাখা হয়। সেই জন্য উহার মাংস তত ভাল নহে। যাহাকে আমরা খাশীর তেল বলি, উহার বেশীর ভাগই ঐ জীবের ব্যাধি পদার্থ অর্থাৎ বাত। মৎস্যেও অখাদ্য খাইয়া থাকে, শ্লেষ্মাদি জলে পড়িবামাত্রই মৎস্যেরা মহানন্দে উহা গ্রহণ করিয়া থাকে। এ জন্য কোন্ মাছ অখাদ্য খায়, কোন্ মাছ খায় না, তাহা জানিয়া নির্দ্দোষ মৎস্য খাওয়া উচিৎ। ডাক্তারগণ রোগীকে বেশী কাতর দেখিলে মাংস কিম্বা মাংসের যুশ ব্যবস্থা করেন, এ নিয়ম দেশ প্রচলিত কবিরাজী ব্যবস্থার কতকটা বিরোধী। মাংস কিম্বা মাংসের যুশ যে ভাত দাইল অপেক্ষা গুরুপাক (over-nutritious) একথা, হয়ত অনেকেই স্বীকার করিবেন। যে রোগীর সহজ পরিপাকযোগ্য ভাত দালে অপকার করে, তাহাকে মাংসের ব্যবস্থা দেওয়া কেমন, তাহা বুঝি না। বলবান সার দিয়া এক বৎসরের জন্য জমি আবাদ করা, আর মাংস দিয়া রোগীর সাময়িক বল বৃদ্ধি করা, একই কথা। উভয় ক্ষেত্রেই ইহার ভাবীফল অশুভকর। নিয়ত এত অল্প আয়ু, এত রোগভোগী

জীব জগতে জন্মিবে কেন? পাশ্চাত্য চিকিৎসাদর্শন স্পর্দ্ধা করেন, দিন দিন তাঁহারা উন্নতির উন্নত শিখরে উঠিতেছেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, রোগ, রোগী, ঔষধ, চিকিৎসক, ঔষধালয়, শুশ্রূষালয়, এ সকল বৃদ্ধি হওয়া কি চিকিৎসার উন্নতি, না, এ সকলের অবনতিতেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি? ব্যারাম না হউক, ঔষধ না খাইতে হয়, চিকিৎসকের অধীনে কখনও না আসিতে হয়, ইহাই সকলে চাহে।

সকালের দোয়া দুগ্ধ দিনের আহারের সময় খাওয়া দরকার এবং বিকালের দোয়া দুগ্ধ রাত্রের আহারের সময় খাওয়া উচিত। এ বেলার দুগ্ধ, ও বেলায় খাওয়া ভাল নয়। সময় বহিয়া গেলে ও বদ্ হাওয়া লাগিলে দুগ্ধের সে স্বাদ, সে ঘ্রাণ থাকে না; উপরন্তু ব্যাধির কারণ হয়। গোয়ালের দুগ্ধ খাইতে নাই, গোয়ালারা দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া লয় ও জল মিশায়। মাখনযুক্ত দুগ্ধই খাদ্য, আর জল মিশাইলে দুগ্ধে বিষ-ক্রিয়া করে। দুগ্ধে শতকরা ৪৭৷৷০ ভাগ জল আছে, তাহার উপর আবার জল মিশান! আর্য্যেরা দুগ্ধে লবণ সংস্রব করেন না, সম্ভবতঃ, দুগ্ধে লবণ-স্বাদ আছে বলিয়া। কলিকাতায় কোন কোন ছাত্র ভাতে লবণ মাখিয়া, সেই ভাত দুগ্ধে মাখিয়া খান, দুগ্ধ বিস্বাদ হওয়ায় এবং তাঁহাদের আর্থিক অস্বচ্ছলতায়, তাঁহারা এমন করেন। অস্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় দুগ্ধ দোহা, দুগ্ধে অন্যান্য ভেজাল মিশান, এ সকল কথা লিখিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। এই সকল নিবারণের জন্য কলিকাতায় এতদিনে চেষ্টা

হইতেছে, দেখিতেছি। এখন লোকের ঝোঁক সহরবাসী হওয়া। সহরে গো-পালন বড় কষ্টকর। সহরে রোদ-বাতাস রীতিমত মিলে না, ঘাসাদি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায় না, গোচারণের মাঠ নাই, কিম্বা অনেক দূরে। পল্লীগ্রামে এ সকল অসুবিধা নাই। পল্লীগ্রামের গরু প্রায়শঃ সুস্থ, সহরের গরু সাধারণতঃ ব্যাধিযুক্ত। ব্যাধিযুক্ত গরুর দুগ্ধ খাইতে নাই। উহাতে গরুর ব্যাধি আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। গরু মোটা সোটা হইলেই নির্ব্যাধি হয় না; সুস্থ গাভী দেখিলেই তাহা চেনা যাইবে, সুস্থ গাভী বেশ স্ফূর্ত্তিপূর্ণ। গরুর দুগ্ধ অন্যান্য খাদ্য অপেক্ষা শীঘ্রই দূষিত হয়, ইহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিজ্ঞান স্থির করিয়াছেন এবং গো-দুগ্ধে অনেক প্রকার সংক্রামক ব্যাধি চলাচল করে। এই হেতুতে, গরুটি সুস্থ কিনা, তাহা জানিয়া তবে সেই গরুর দুধ খাওয়া ভাল। ভাতের মার ইত্যাদি খাদ্য গরুকে অধিক খাওয়াইতে নাই। গো-পালন যে গৃহস্থের ধর্ম্ম, তাহা এখন আমরা ভুলিয়া যাইতে বসিয়াছি। আর আমাদের ছেলেরা পবিত্র গোবর ও চোনাকে এখন গরুর গু-মূত বলিয়া থাকেন; কিন্তু সেই দিন মনে করুণ, যখন অধ্যাপকের গৃহে ছাত্রেরা গো-পালন ও গো-চারণ করিত! জননী স্বর্গের অপেক্ষা বড়, গরু আবার জননী অপেক্ষা বড়; কারণ মাতৃ-স্তন্য দুইদিন বেশী খাইলে দাঁতে পোকা ধরে, কিন্তু গোদুগ্ধ আজীবন খাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদও গো দুগ্ধের একটি গুণ বলিয়াছেন, 'প্রাণধারকত্বম্।' লোকালয় ব্যতীত বনে গরুর যখন থাকিবার স্থান

নাই। তখন গরুর হিতার্থে মানুষের প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। ভাল দুধে চিনি দিয়া খাওয়া বেশীর ভাগ, ভাল দুগ্ধ স্বভাবতঃই মিষ্ট স্বাদযুক্ত। কাঁচা দুগ্ধ উপকারী, শরীরের ব্যাধি পদার্থ নির্গম করে, শরীর পাতলা করে। কিন্তু 'কাঁচা' গন্ধ করে বলিয়া দেশে চলন নাই। জ্বাল দেওয়া দুগ্ধেরই চলন আছে। সামান্য মত জ্বাল দিয়া দুগ্ধ খাওয়া উচিত, ইংরাজীতে warmed—not boiled যাহাকে কহা যায়। বেশী জ্বাল দেওয়া ঘন দুগ্ধ কিম্বা ক্ষীরাদি খাইয়া হজম করিতে পারে, বঙ্গদেশে এমন লোক এক্ষণে কম। বেশীক্ষণ ধরিয়া দুগ্ধ জ্বাল দিলেই দুগ্ধের দোষ নষ্ট হয়, এটী আমাদের ভ্রম বিশ্বাস। ব্যারাম হইলে দুধ খাওয়া উচিত নয়। আগে জ্বরাদিতে কবিরাজ মহাশয়েরা দুধ খাইতে বলিতেন না। মহিষের দুগ্ধ এদেশে এখন চলিতেছে ; যদিও গো-দুগ্ধের শ্রেষ্ঠত্ব অনেক বেশী, তবুও খাওয়া যাইতে পারে। গোয়ালাদের মহিষের দুধে জল মিশাইবার সুযোগ বেশী। দুধ বেশ ধীরে ধীরে পান করিতে হইবে। ভাত কি রুটি দিয়া দুধ খাওয়া যাইতে পারে। দেশে দুধের এমন দুর্ভিক্ষ হয় নাই, যে টিনের দুধ ব্যবহার করিতে হইবে। বলি, মধু থাকিতে গুড় কেন ?

কাঁচা দুগ্ধে কাঁচা ফল দিয়া মাটির কিম্বা পাথরের পাত্রে দধি জমাইয়া খাওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সচরাচর যেরূপ দধি পাওয়া যায়, তাহাও খাওয়া যাইতে পারে। এক্ষণে পাশ্চাত্য-জগত হইতে দধি সেবনের একটা বাতাস আসিয়াছে, উহারই

ফলে অনেকে দধি সেবন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তদফলে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, দধি স্বাস্থ্য ও জীবনীশক্তি বৃদ্ধি অর্থাৎ দীর্ঘায়ু করে। ঘোলও ভাল জিনিষ। রোগীকে গরম দুধে অম্ল দিয়া ছানা কাটিয়া, সেই দুধ যাহা ঘোলের মত স্বাদযুক্ত (whey), তাহা ছাঁকিয়া খাওয়ান হইতেছে। ইহা ডাক্তার-দিগের ব্যবস্থা। ছানা-মাখন ভাল জিনিষ। মাখন, ঘৃতের পরিবর্ত্তে, তরকারিতে দিলে সুস্বাদ হয়। পূর্ব্বোক্ত জিনিষ সমস্ত ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। গব্য পদার্থ অতি সার যুক্ত জিনিষ, উহা যত কম মাত্রায় খাইতে পারা যায়, ততই ভাল। অধিক খাইলে শরীর মোটা করে, শরীরের বলবৃদ্ধি না হইয়া শরীর মোটা হওয়ায় লাভ কি ?

রাত্রের আহার।—আহারের একটা মাত্রা থাকা উচিত। মধ্যাহ্নের আহার যদি এক হয়, সকালের জলযোগ একের ছয় হইবে, বৈকালের জলযোগ একের ছয় এর কম হইলে ভাল হয়, রাত্রের আহার ব্যাধিতের একের দুই, সুস্থের তিনের চার। এই পরিমাণ খাওয়াই আমাদের বিজ্ঞানসম্মত। উদর পূর্ণ করিয়া খাওয়া দোষের ; কিছু বাকি থাকিতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। চলিত কথায়ও বলে—উন ভাতে দুনু বল, ভরা ভাতে রসাতল।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকের পক্ষে রুটি চিবান কষ্টকর ; পশ্চিম বঙ্গের লোকে পাতলা রুটি পাইলেই সুখী হন। কেহ কেহ মোটা রুটি ভালবাসেন। পশ্চিম দেশে মোটা রুটিরই চল। ময়দা অপেক্ষা আটার রুটি ও লুচি ভাল হয়। মাখন কি গাওয়া

ঘৃত রুটিতে মাখিলে রুটি মোলায়েম হয়। প্রাকৃতিক মতে, চোকল শুদ্ধ ময়দার রুটিরই সর্ব্বোচ্চ স্থান। চোকল বড় পুষ্টিকর খাদ্য; খাইতেও মিষ্ট, দাস্তও পরিস্কার করে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এরূপ রুটি খাইতে বলি; এক মাসেই তাহারা ইহার সুফল উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ছাত্র জীবনে বেশী আরাম করা ভাল নহে, নিত্য লুচি, কচরী খাওয়া তাহাদের পক্ষে 'বাবুগিরি'। এরূপ রুটি পরিমাণে, ক্রমশঃ বেশী খাইতে পারা যায়। চোকা শুদ্ধ ময়দা খাইতে বলিলাম, তাহাতে কেহ যেন রাগ না করেন, কারণ কথাটা শুনিতে রুক্ষ বোধ হয় ও ঐরূপ ময়দা মাখিলেও সাধারণ ময়দার মত আঠা হয় না।

ঘৃতের যেরূপ দোষ পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, তাহাতে বাজারের ঘৃত দিয়া প্রস্তুত করা মোহনভোগ নিত্য উপভোগ করা, কতদূর সঙ্গত, তাহা আপনাদের বিবেচনাসাপেক্ষ। সুজির পায়স বরং ভাল খাদ্য। ময়দার দ্বারাও আমরা একরূপ পায়স করিয়া থাকি, তাহাও নিম্নে লিখিত হইল। পূর্ব্বোক্তরূপ চোকল শুদ্ধ ময়দা একটা বাটিতে জলে গুলিয়া তরল করিতে হইবে, তারপর জল জ্বাল দিয়া ফুটাইয়া তাহার ভিতর ঐ তরল ময়দা দিয়া কেবলই নাড়িতে হইবে, কিছুক্ষণ পর চিনি, মাখন, কিম্বা কাঁচা দুগ্ধ দিয়া এই পায়স নামান হইবে। এ প্রক্রিয়ায় পায়স পাক দেশে রীতি নাই; কিন্তু লঘুপাক হয় বলিয়া লিখিলাম। এই প্রবন্ধ এইরূপে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' করা গেল।

প্রয়োগ।

—:০:—

মৃত্তিকা।—বালুকাবিহীন মৃত্তিকা জলে গুলিয়া, আপাদমস্তক মাখিয়া, বসিয়া, শরীরে শুখাইতে হইবে; তারপর, গামছা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া, জল দ্বারা শরীর পরিস্কার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে, লোমকূপ পরিস্কার হয়, ঘর্ম্ম সহজে নির্গত হইতে পারে, দ্বিতীয়তঃ, শরীর স্নিগ্ধ হয়, তৃতীয়তঃ মৃত্তিকার বিশেষ ক্ষমতা যে, উহা শরীরের জমাট মলকে ভাঙ্গিয়া দেয়, তজ্জন্য সাধারণ রোগী মাত্রেরই মৃত্তিকা লেপন ব্যবস্থা।

একটী পাত্রে বালুকাবিহীন মৃত্তিকা রাখিয়া তাহাতে আন্দাজমত জল দিয়া, নখ দ্বারা নাড়িতে হইবে। এরূপ করিলে, কাদা হইবে। স্বতঃ কাদার দ্বারাও, এ প্রয়োগ চলিতে পারে, কিন্তু অনেক সময় কাদা পাওয়া যায় না বলিয়া উপরোক্ত প্রকরণ লিখিত হইল। ঐ কাদা, রোগীর হাতের ২-২॥০ হাত লম্বা ও ॥০-৸০ হাত প্রস্থ কাপড়ে, পুলটিসের মত, পুরু করিয়া বিছাইতে হইবে। তারপর, কাপড়ের কাদাযুক্ত পার্শ্ব, দক্ষিণ ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া, তলপেট ও পাছা বেষ্টন করিয়া শরীরে লাগাইয়া দিতে হইবে। বিশেষরূপে আঁট রাখিবার জন্য, শুক্না এক টুক্রা কাপড়, উহার উপরে জড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে এবং ফিতা দ্বারা বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। এরূপ মৃত্তিকা প্রয়োগের পর, রোগীকে বসিয়া কিম্বা শুইয়া

থাকিতে হয়। মৃত্তিকার পটি শুখাইলে, খুলিয়া ফেলিতে হয়; কিম্বা ব্যবস্থা করা হইলে, পুনরায় ২।৩ বার পটি পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

তলপেটের ভিতর যে সকল যন্ত্র আছে, উহাদের দোষ ঘটিলেই মল জমিতে থাকে এবং তলপেটেই মল জমিবার প্রধান স্থান; তজ্জন্য এ প্রয়োগ এ স্থানে ব্যবস্থিত হইয়াছে। এ প্রয়োগের পর, কোষ্ঠ শুদ্ধি এবং মলীয় প্রস্রাব নির্গত হয়; কারণ মৃত্তিকার গুণ, মলকে জমাট ভাব হইতে ভাঙ্গিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেওয়া। মাথার সঙ্গে তলপেটের সাক্ষাৎসম্বন্ধ, তজ্জন্য মাথার ব্যারামীরা, এ প্রয়োগে অনেক উপকার পান। কঠিন শয্যাগত রোগীকে এ প্রয়োগ অবাধে ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে এইরূপ পটি দেওয়ান হয়। তাহাতে আভ্যন্তরিক যান্ত্রিক বিশৃঙ্খলতা দূর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রসবজনিত যন্ত্রণাও ক্রমশঃ কমে।

শরীরে ক্ষত থাকিলে, ক্ষতের উপর, এইরূপ মৃত্তিকার ছোট ছোট পটি দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে ক্ষতের আভ্যন্তরিণ মলকে জল করিয়া বাহিরে নির্গত করে, অর্থাৎ রস গলে।

বালুকা।—কোষ্ঠবদ্ধের রোগীকে আধ আনা পরিমাণ বালুকা, আহারের আধ ঘণ্টা পরে ব্যবস্থা করা হয়। সমুদ্রের বালুকায় উপকার বেশী, কিন্তু তাহা সচরাচর পাওয়া যায় না বলিয়া সাধারণ নদীর চরের বালুকাতেই চলিতে পারে। সাধারণের ভ্রম বিশ্বাস যে, বালুকা উদরস্থ হইলে, দাস্ত হইতে

থাকে। যাহারা চর প্রদেশে বাস করে, তাহাদিগকে কত রকমে বালুকা উদরস্থ করিতে হয়; কিন্তু তাহাদের স্বাস্থ্য কত সুন্দর। পেটের অসুখের রোগীকেও বালুকার ব্যবস্থা করা যায়।

সকালে ও সন্ধ্যায়, একটি পাত্রে, খানিকটা বালুকা লইয়া, অগ্নিতে রোগীর ঘরের এক কোণে উত্তপ্ত করা উচিত। উহাতে ঘরের দূষিত বায়ু শুদ্ধ হয় এবং প্রত্যক্ষতঃ, ঘরের দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

বালুকা নির্দ্দোষ ও দোষনাশক পদার্থ। জলের ভিতর বালুকা ঢালিয়া দিয়া, কয়েক ঘণ্টা পরে, উপরের জল খাওয়া যাইতে পারে। যেখানে ভাল জল মিলে না, সেখানে এরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ম্যালেরিয়া প্রধান দেশ প্রায়শঃই সেঁত-সেঁতে, ঐ সকল স্থানে পথে বালুকা ছড়াইয়া দিলে, সংক্রামকতা কমিতে পারে। ইহা পরীক্ষা করা, অতি কঠিন কথা নহে। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাটীতে, বাটীর কর্ত্তার মন ও সাধ্য থাকিলে ইহার পরীক্ষা আংশিক ভাবে হইতে পারে।

জল।—সময়ের একটা প্রভাব আছ, ঐ প্রভাবের জন্য সূর্য্য উঠিবার কিছু পূর্ব্বে স্নান করা ব্যাধিতেরও ব্যবস্থা। অন্য সময়েও স্নান করা যায়। ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, নাভি হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত শরীরের যে অংশ কাপড়ে ঢাকা থাকে, তাহা পুরু ও খস্‌খসে গামছা দিয়া, ১০।১২ মিনিট যেন ঘর্ষণ করেন। নদীর জলে কিম্বা তোলা জলে স্নান করা যাইতে পারে।

স্নানের উদ্দেশ্য শরীর ঠাণ্ডা করা; যতক্ষণ না শরীর ঠাণ্ডা হয়, ততক্ষণ স্নান করা উচিত। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা বোধ হইলে,

গরম করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঠাণ্ডা ও গরম জল সম্বন্ধে এই কথা যে, উভয়ই অধিক হইলে ব্যাধির কারণ হয়। জল স্পর্শ মাত্রেই যাহার শরীর ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট হয়, জানিতে হইবে তাহার শরীর ব্যাধি-মলে পরিপূর্ণ।

আমাদের বিধান কর্ত্তারা মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান, নীরোগ হইবার জন্য নির্ণয় করিয়াছেন। একে শীতকাল, তাতে সকাল বেলা, ঠাণ্ডার উপর ঠাণ্ডা। কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখুন, জানিতে পারিবেন, এ সময় জল ত ঠাণ্ডাই নহে, বরং একটু গরম; তারপর বেলা হইলে সূর্য্যের কিরণে শরীর গরম করিতে পারেন, কিম্বা গায়ে কাপড় দিয়া গরম হইতে পারেন; আর দেখিবেন স্নানের পূর্ব্বে বড় শীত বোধ হয়; কিন্তু স্নাত হইয়া উঠিলে, একটা গরম ভাব সমস্ত শরীরে ছড়ায়, বেলা হইলে সে প্রভাব তত হয় না; শীতের রাত্রি বড়, রাত্রি থাকিতে ঘুম ভাঙ্গে, সকালও বড়, নিত্যকৃত্য করিয়া যাউন,—ভগবানের নাম, শৌচাদি, প্রাতঃস্নান, আহ্নিক করুণ, তবে ভানুমান দেখা দিবেন। শত্রু দেখিলে পশ্চাৎপদ হওয়া কাপুরুষের কাজ; শীতে জড়সড় হইয়া জামা কাপড় মুড়িয়া, ঘরের ভিতর থাকিয়া, শীতকে প্রশ্রয় দিবেন না, শীতের সহিত সম্মুখ রণে প্রবৃত্ত হইবেন। ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায়, যে শাস্ত্রকারদিগের লিখিত নিয়মগুলি তাঁহাদের অনেক চিন্তার ফলস্বরূপ, কার্য্যক্ষেত্রে ইহার উপকারিতার প্রমাণ পাওয়া যাইবেই।

বৃষ্টির সময়, বাহিরে বসিয়া, কিম্বা শুইয়া, সহ্যমত ধারা লওয়া দরকার। তারপর গরম কাপড়ে শরীর ঢাকিয়া রাখিতে হয়। সাধারণ রোগীর এইরূপ বৃষ্টি-স্নান ভাল। দেশে ঘামাচীর রোগীকে বৃষ্টির ধারা লইতে দেখা যায়। অনেকে বৃষ্টির জল লাগিলে, বিকার হইয়া মরিবার ভয় করেন; কিন্তু সে ভয় তাঁহাদের কাল্পনিক; কারণাধীনে বিকার হইতে পারে বটে।

বাহ্য ও প্রস্রাবের পর, মল ও প্রস্রাবের দ্বারে জল ব্যবহার অবশ্যকরণীয়। কিয়ৎক্ষণ ধরিয়া জল ঢালিতে হইবে ও অঙ্গুলি দিয়া উভয় দ্বার ঘর্ষণ করিতে হইবে। বঙ্গদেশে, সভ্য সমাজে, প্রস্রাবের পর জল লওয়া, অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে এবং 'অতি' সভ্য সমাজে, মলত্যাগের পর, কাগজ লওয়া প্রবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। এ সকল অতি দুঃখের কথা, কারণ জল ব্যবহারের ভিত্তি বিজ্ঞানের উপর।

* * * * *

নিম্নের প্রয়োগ দুইটি প্রাকৃতিক চিকিৎসার মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহা বিজ্ঞান জগতের অদ্ভুত আবিষ্কার, এমন কি, ইহাকে ভগবৎ প্রেরিতও বলা যাইতে পারে। এই প্রয়োগ দুইটি অন্য কোন প্রয়োগের বিনা সাহায্যে ব্যাধি নিরাময় করিতে সক্ষম।

প্রথম ঘর্ষণ প্রয়োগ।

একটী বড় গাম্‌লায়, এরূপ পরিমাণ জল দিতে হইবে, যে, বসিলে নাভির দুই অঙ্গুলি উপর হইতে হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত ডুবিতে পারে। জল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হওয়া চাই। এই প্রয়োগের

সময় গামলায় বসিয়া প্রথমতঃ পা দুখানি কম্বল কিম্বা গরম কাপড় দিয়া মুড়িয়া দিতে হইবে। তৎপরে একখানি মোটা খসখসে গামছা দিয়া, জলে ডোবা অংশ ঘর্ষণ করিতে হইবে। নাভি হইতে বস্তি পর্য্যন্ত, উপর হইতে নীচে, অধিকক্ষণ ঘর্ষণ করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে উঁচু হইয়া উঠিয়া পাছা ও গুহ্য দেশে ঘর্ষণ দিতে হইবে। এরূপ প্রয়োগে ১৫।২০ মিনিট সময়ের দরকার হয়। শরীরের জলে-ডোবা অংশ ছাড়া অন্য অন্য অংশে যেন জল না লাগে। ঘর নির্ব্বাত করিয়া এ প্রয়োগ করিতে হয়। কঠিন রোগী প্রথমতঃ গামলায় বসিয়া অস্থির হইতে পারে। কিন্তু জলের জীবনদায়িনী শক্তি থাকাতে, কিছুক্ষণ বসার পর, আপনি স্থৈর্য্য আসে, শরীর সবল বোধ হয়। এরূপ জল প্রয়োগের পর, রোগীকে, হয় পরিশ্রম করাইয়া, নয় রৌদ্রে রাখিয়া, নয় মোটা কাপড়ে ঢাকিয়া, গরম করিতে ও সুস্থির করিতে হয়। কাসির রোগীকে বুক পর্য্যন্ত জল দিয়া এ প্রয়োগ করান হয়।

জ্বরের রোগীর এই প্রয়োগ করার পর মাথা-ধরা ও জ্বরের যন্ত্রণা অনেক কমে। এই প্রয়োগের পর জ্বরের তাপ কোন কোন রোগীর কমিতে থাকে, কাহারও খুব বেশী জ্বর কিম্বা তাপ দেখা দেয়। শেষোক্ত লক্ষণ খারাপ নহে, কারণ বেশী জ্বর হইয়া, জ্বরটা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। জ্বরে জল ব্যবহার, আমাদের দেশের পূর্ব্বকর্ত্তারা করিতেন। ঘরে দরজা দিয়া পিঁড়িতে বসাইয়া, গরম জলে শরীর ধুইয়া ও ঘষিয়া দিয়া, গা

মুছিয়া, কাপড় ঢাকা দেওয়া হইত। ঔষধে যে রোগীর জ্বর ছাড়িত না, তাহার এইরূপ করিয়া জ্বর ছাড়াইতে দেখা গিয়াছে। বিশেষ বিষমজ্বরে স্নানাদির ব্যবস্থা কবিরাজ মহাশয়েরাও দিতেন।

দ্বিতীয় ঘর্ষণ প্রয়োগ।

মধ্যম রকমের একটা গামলা জলে পূর্ণ করিতে হইবে। ঐ জল যত শীতল করিতে পারা যায়, ততই ভাল। ঐ গামলাটির সঙ্গে সংলগ্ন করিয়া একখানি জলচৌকী রাখিতে হইবে। চৌকীখানি গামলা অপেক্ষা এক ইঞ্চ উচ্চ হইবে ও উহার কিনারা চারি অঙ্গুলি আন্দাজ বাহির হইয়া থাকিবে। তাহা হইলে, জলচৌকীর কিনারা, গামলার কিনারা পার হইয়া, জল পর্য্যন্ত আসিবে। তারপর, ঢিলে কাপড় পরিয়া, কিম্বা বস্ত্রবিহীন হইয়া, উক্ত জলচৌকীতে বসিতে হইবে। দুই পায়ের নীচে, দুইখানি ইট, সুবিধার জন্য বাঁকাভাবে রাখিতে হইবে। বসিয়া একখানি রুমাল দক্ষিণ হাতে করিয়া, বামহস্তে পুরুষাঙ্গের উপরের চর্ম্ম, দুই নখের মধ্যে চাপিয়া ধরিতে হইবে। চর্ম্ম এমন ভাবে ধরিতে হইবে যে, লিঙ্গের অগ্রভাগ ও প্রস্রাবের দ্বার সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায়, তারপর, ধীরে ধীরে—গামলার জলে রুমাল ডুবাইয়া—উক্ত চর্ম্মের অগ্রভাগে ঘর্ষণ দিতে হইবে। একবার চর্ম্মের সহিত রুমাল সংলগ্ন করিয়া নীচে নামাইতে হইবে, পুনরায় জলপূর্ণ রুমাল উপরে তুলিতে হইবে। অনবরত এইরূপে ঘর্ষণ দিতে হইবে। এ ঘর্ষণ কুড়ি মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা দেওয়ার প্রয়োজন।

এ প্রয়োগে ঐ চর্ম্মের অগ্রভাগ ও দুই হাতের কয়েকটী অঙ্গুলি ব্যতীত শরীরের আর কোন অংশ না ভিজে, তাহা বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। কোন কোন রোগীকে বড় গাম্‌লার ভিতর বসাইয়া এ প্রয়োগ দেওয়ান হয়, সে ক্ষেত্রে তাহাদের পাছা ভিজে। কোন কোন ব্যাধিতে পাছা ভিজাইয়া স্নান দেওয়া হয়। জল কম দিয়া, গামলার ভিতর জলচৌকী বসাইয়া বড় গামলাতেও এ প্রয়োগ দেওয়া চলিতে পারে। কোন কোন ব্যক্তির উক্ত চর্ম্মের অভাব দেখা যায়, তাহাদের এ প্রয়োগের বিধি দেওয়া যায় না। স্ত্রীলোককে এ প্রয়োগ দেওয়ার বিশেষ বিধান আছে। তাঁহারাও স্ত্রী অঙ্গের বহির্ভাগে জলপূর্ণ রুমাল দ্বারা ঘর্ষণ দিবেন। এ সকল প্রক্রিয়া সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম করিয়া তবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে, সকলকে বলি।

পাঠক পাঠিকাগণ লেখককে ক্ষমা করিবেন। কারণ, উপরে শরীরের কয়েকটা গুহ্য স্থানের নামোল্লেখ করা হইল। চিকিৎসা পুস্তকে এগুলি পরিহার করিবার উপায় নাই। দ্বিতীয়তঃ, আর একটা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করিতে হইতেছে: মুসলমান জগতে যে 'মুসলমানী' করার প্রথা প্রচলিত আছে। উহা কামকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আরব প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, কামের উদ্দীপনা অত্যন্ত বেশী হয়, সেই জন্য ঐ স্থানটীতে অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যবস্থা আছে এবং তাহা ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ঐ স্থানটীতে অর্থাৎ লিঙ্গের উপরকার চর্ম্মের অগ্রভাগে সূক্ষ্মাতি-

সূক্ষ্ম যে সকল অনুশিরা আছে, তাহাদের কার্য্যকারিতা অত্যন্ত বেশী; এই জন্য এই স্থানে, উপরোক্ত জল-ঘষণ-প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত করিয়া, আমাদের দেশেও, কর্ণবেধের সময় কাণ ফোঁড়ানর প্রথা আছে। ইহাও বালকের ভাবী জীবনে মস্তিষ্কের পরিচালনা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বিহিত হইয়াছে। অনুশীলনের ফলে, শেষোক্ত বিষয় দুইটি যেমন আমরা বুঝিয়াছি,—তেমনি লিপিবদ্ধ হইল।

পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ দেওয়াতে, কঠিন রোগীর ঘষিত স্থানে নোনছাল যায়। কিন্তু তাহাতে ঘর্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। নরম গামছা দিয়া, আরও ধীরে ঘষণ দিতে হইবে। ঘর্ষণেই জল-শক্তি শরীরে চালিত হয়, ঘষণই মুখ্য কথা। ঘষণের ক্ষতকে সজীব রাখিবার জন্য ক্ষত স্থানে জলপটি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। ঐ ক্ষত দিয়া শরীরের অনেক ক্লেদ বাহির হয়। ইহাও দেখা গিয়াছে, সামান্য রোগীর বহুদিন ঘষণ দিলেও ক্ষত

* * * * *

শ্লেষ্মা ঘটিত ব্যাধিতে খুব ঠাণ্ডা জল মুখের ভিতর ৫। মিনিট রাখান হয়। উহাতে শ্লেষ্মার প্রকোপ কমিতে থাকে শ্লেষ্মা উঠে। শ্বাসরোধক ব্যাধিতে, ডিপথিরিয়াতেও, এ প্রয়ে করান হয়।

কাটিয়া গেলে, কিম্বা ভাঙ্গিলে, কিম্বা পুড়িলে জলপা ব্যবস্থা দেওয়া হয়। ক্ষত স্থানের গুরুত্ব অনুসারে পা

কাপড়ের ভাঁজ বাড়ান হয় এবং পটি পরিবর্ত্তনের বারের নির্দ্দেশ করা হয়।

ঘুম না আসিলে, কিম্বা অনিদ্রা রোগে, মাটির কিম্বা ঐরূপ করিয়া জলের পটি তলপেটে দিয়া শুইলে ঘুম হইতে পারে। কিন্তু জলের পটিতে মধ্যে মধ্যে জল দিয়া বেশ জল-ভরা রাখিতে হয়। এরূপ পটিতে আভ্যন্তরীণ উত্তাপ বাহিরে আনে, অর্থাৎ পটি গরম হয়। প্রসূতিকে এই উভয় পটি দেওয়ার পর, পশমের টুক্‌রা দিয়া জড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এ সকল প্রয়োগের পর, প্রস্রাবের রং লাল ও ঘন হয় এবং শরীরও কিছু দুর্ব্বল হয়। এ সকল ভাল লক্ষণ, অর্থাৎ ব্যাধি কমিবার পথে চলিয়াছে, জানিতে হইবে।

জল প্রয়োগের ইহাই শেষ কথা যে, ঘর্ষণযুক্ত প্রয়োগই প্রধান। যতই ঘর্ষণ হইবে, ততই শরীর ঠাণ্ডা হইবে, ইহা যেন কেহ না ভাবেন, কারণ ঘর্ষণই উত্তাপের অন্যতম কারণ। ঘর্ষণ জল-প্রয়োগ Sedative অবসাদক নহে, উত্তেজক Stimulant, বড়ই স্ফুর্ত্তির জিনিষ। একটা ঘর্ষণ প্রয়োগের পর, শক্তি কোথা হইতে চলিয়া আসে। আগে যে মানুষ কেঁচোর মত গড়াগড়ি যাইতেছিল, প্রয়োগের পর সে সর্পের মত ছুটিবে। এক কথায়, জল-ঘর্ষণে জীবনীশক্তির বৃদ্ধি করে। এইরূপ প্রয়োগ রোগীকে দৈনিক ২।৩ বার দেওয়ার দরকার।

বাষ্প।—এ প্রয়োগের উদ্দেশ্য শরীর ঘামান। বাষ্পে দেহের ক্লেদ ঘাম হইয়া বাহির হইতে সুন্দর অবকাশ পায়।

শরীর ঘামিলে ব্যারামের ভয় কমে। শরীর 'প্রচুর' রকমে এবং 'সাধারণ' রকমে ঘামান যাইতে পারে। প্রচুর রকমে ঘামাইতে হইলে ৩।৪টী পাত্রের দরকার হয় এবং শুইবার উপযুক্ত ফ্রেমের দরকার হয়। রোগীকে সপ্তাহে একবার কি দুইবার প্রচুর ভাবে ঘামান উচিত। কিন্তু কঠিন রোগীকে প্রথমতঃ এরূপ না ঘামাইয়া সাধারণভাবে ঘামানই ভাল।

"প্রচুর" ঘর্ম্ম প্রয়োগ।

প্রচুর ঘামানর প্রকরণ প্রথমতঃ লিখিত হইল। বেঞ্চের মত উচ্চ করিয়া এবং ঐরূপ পায়া দিয়া একটী কাঠের ফ্রেম করিতে হইবে। উহার উপরিভাগ ১॥০—২ হাত চওড়া ও ৪ হাত দীর্ঘ হইবে। কিন্তু উহার উপর তক্তা থাকিবে না, ফাঁক ফাঁক করিয়া কাঠের গজ দিতে হইবে, নয়, দড়িতে কি বেতে ছাইয়া দিতে হইবে। এরূপ ফ্রেমের নিম্নদেশে এককালীন ৩টি হাঁড়ি বেঁড়ের (স্থাপনের গোলাকার দ্রব্য) উপর ১।০ হাত অন্তর সাজাইয়া দিবে ও ঢাকনি খুলিয়া দিবে। তারপর ঐ ফ্রেমের উপর চিত, উপুর, কাত হইয়া শুইয়া শরীর প্রচুর রকমে ঘামাইবে। ২০ মিনিট কি আধ ঘণ্টা ফ্রেমের উপর থাকা যাইতে পারে। শুইবার সময় শরীর ও ফ্রেম কম্বলে কিম্বা মোটা কাপড়ে এমন করিয়া ঢাকিবে, যেন বাষ্প না বাহির হইতে পারে। বাষ্পের উত্তাপ বোধ হইলে, মধ্যে মধ্যে মধ্যেকার বাষ্প কাপড় তুলিয়া বাহির করিয়া দিবে। কাপড়ের মধ্যে নিতান্ত ফাঁপর বোধ হইলে, মুখ কাপড়ের বাহির করিয়া দিবে

বাষ্প কম হইলে, ৪র্থ পাত্র যাহা উনুনে আছে, তাহা একটির স্থানে দিয়া সেটিকে আবার উনুনে গরম করিতে দিবে ; এইরূপে মধ্যে মধ্যে পাত্র বদ্‌লান দরকার। এ প্রয়োগের ঠিক পরেই, সর্ব্ব শরীর ঠাণ্ডা জল দিয়া বিশেষরূপে ধুইয়া দেওয়া উচিত। তারপর শরীর মুছিতে হইবে। বাষ্পে শরীরের মলকে গলাইয়া শরীরের ভিতর রাখে, পূর্ব্বোক্ত প্রথম ঘর্ষণ প্রয়োগ ও দ্বিতীয় ঘর্ষণ প্রয়োগের বলে ঐ সকল মল শরীরের বাহিরে আসে।

পাশ্চাত্য অধ্যাপকগণ, সুবিধার জন্য বাষ্প প্রয়োগের অনেক রকম যন্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছেন, উহা আমাদিগের পক্ষে ব্যয়সাধ্য। এসিয়ামাইনর প্রদেশে, ছোট বড় লোক ও স্ত্রীলোক বালকে, এরূপ প্রক্রিয়া প্রতি সপ্তাহে ২।১ বার করিয়া থাকে, তথায় বাষ্প স্নানের ব্যয়ও সুলভ। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্নানাগার থাকে, তথায় সকলে যায়। ঘরটী অগ্নির দ্বারা এমন গরম করিয়া রাখা হয় যে, ঘরে গেলেই শরীর ঘামিতে থাকে, তারপর গরম ও ঠাণ্ডা জলের বন্দোবস্ত আছে, উভয়ে মিলাইয়া শরীর ধুইয়া ফেলে। ইহা তাহাদের বড় আরামের ও আদরের জিনিষ।

"সাধারণ" ঘর্ম্ম প্রয়োগ।

চেয়ারের নীচে একটী পাত্র রাখিয়া কাপড়ে শরীর, চেয়ার, পাত্র ঢাকিয়া, সাধারণ প্রয়োগ লইতে হয়। পায়ের নীচে পাত্রটীর উপর সুবিধার জন্য, দুই খানি কাঠের গজ দেওয়া যাইতে পারে। আর বাকি সমস্ত প্রক্রিয়া প্রচুর ঘর্ম্ম প্রয়োগের

ন্যায়। তবে শরীর সম্পূর্ণ জলে না ধুইয়া, ভিজা গামছায় মুছিয়া ঠাণ্ডা করা যাইতে পারে।

বাতের স্ফীত স্থানে, ব্যথার স্থানে, ক্ষত স্থান প্রভৃতিতে স্থানিক বাষ্প প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। একটী পাত্রের বাষ্পের ভিতর পীড়িত স্থান রাখিয়া পাত্রের সহিত কাপড় ঢাকিয়া, কিয়ৎক্ষণ বাষ্প লইয়া, ব্যাধিত স্থানকে ঘামাইবে, তারপর ঐ স্থান শীতল জলে বেশ করিয়া ধুইবে। গলনালী প্রদাহ প্রভৃতি রোগে, ডাক্তারেরা জলের ভাপ্‌রা, নলীয় যন্ত্রের সাহায্যে ঐরূপ পীড়িত স্থানে দিয়া থাকেন।

ধুম।—ধূমে, শরীরের উপরিভাগের অর্থাৎ মাথা, কপাল প্রভৃতির শ্লেষ্মা, জল প্রভৃতি নাসিকা, মুখ, চোখ দিয়া বাহির করে। ধূম ব্যবহার করিতে হইলে ঐরূপ ধূমপূর্ণ ঘরে যাইলে, কিম্বা কাপড়ের ভিতর ধূম সহিত অগ্নি বেষ্টন করিয়া, মুখে লাগাইলে, চক্ষু ও নাসিকা দিয়া ক্লেদ নির্গত হয়। তারপর ঠাণ্ডা জলে ধুইতে হইবে, ইত্যাদি।

কবিরাজেরা ধূমের ব্যবস্থা পূর্ব্বে দিতেন, জানিতাম। এক জন প্রথিতনামা কবিরাজ, মৃতবৎসা রোগে, সূতিকাগারে, নানা প্রকার দ্রব্যের ধূমের ব্যবস্থা করায়, সে যাত্রায় সন্তানটি রক্ষা পাইয়াছিল। গরুর ঘরে আমরা ধূম অর্থাৎ সাঁজাল দেওয়ার ব্যবস্থা করি, কিন্তু মানুষের সময় আমরা ধূমে কষ্টানুভব করি, এটা যুক্তিযুক্ত নহে।

রৌদ্র ও অগ্নি।—গরমের দিনে, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে,

বস্ত্রবিহীন হইয়া কিম্বা সামান্য কাপড় পরিয়া, শরীর কম্বলে কিম্বা কচি পাতা (কদলী প্রভৃতির) দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া আধ ঘণ্টা, তিন কোয়ার্টার পড়িয়া থাকিতে হইবে। পূর্ব্বে দেখিতে হইবে যে, সে সময় মেঘ ও বাতাস না থাকে, কিম্বা সামান্য থাকিতে পারে। রৌদ্রে চারি পাশ ঘুরিয়া বেশ করিয়া শরীর ঘামাইতে হইবে। মাথায় ও তলপেটে দুই খানি ভিজা গামছা সূর্য্যের তেজ নিবারণের জন্য জড়াইতে হইবে। মাদুর পাতিয়া শুইবে, একটি ছোট বালিশ সুবিধার জন্য লওয়া যাইতে পারে। পাতায় শরীর ঢাকিলে পাশ ফিরিবার সময় পাতা সরিয়া যাইবে, তজ্জন্য একজনের পাতা পুনঃ সংস্থাপনের জন্য থাকার দরকার। শরীর ঘামানর পর শরীর সম্পূর্ণ ধোয়া ও পূর্ব্বোক্ত ঘর্ষণ প্রয়োগ দেওয়ার দরকার। কম্বল কি পাতার পরিবর্ত্তে ভিজা কাপড়ে শরীর ঢাকিয়াও, এ প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

এ প্রয়োগের বর্ণনা শুনিয়া, মনে ধনুষ্টঙ্কারের বিভীষিকা আসে। কিন্তু কার্য্যতঃ, সূর্য্যের তেজ লওয়ার পর, শরীর ঘামিলে, আরামে ঘুম পায়, এ প্রয়োগ ব্যাধি বিতাড়িত করিবার অমোঘ অস্ত্র। সূর্য্যদেবের শুভদৃষ্টি হইলে, ব্যাধির ঘোরা রজনী অন্তর্দ্ধান করে।

প্রত্যক্ষ উত্তাপ অর্থাৎ কড়া আগুণ কি সূর্য্যের প্রখর তেজ লাগান, শরীরের পক্ষে কোন অবস্থাতেই ভাল নহে; উহাতে ব্যাধি পদার্থকে কঠিন করে। পুলটিস ও ফোমেন্‌টেসনে

আগুনের তেজ জলীয় দ্রব্যের ভিতর দিয়া আসে, তজ্জন্য উহাদিগকে কতকাংশে অনুমোদন করিতে হয়। বহ্নি সেবন স্থান বিশেষে অবস্থিত হয়।

বায়ু। বায়ুই আয়ু। সকাল ও সন্ধ্যার বায়ু বড়ই উপভোগ্য জিনিষ। যত বড়ই রোগী হোক না কেন, রাত্রে দোর জানালা একেবারে বন্ধ করিয়া থাকিতে পরামর্শ দেই না; এমন কি, শীতের জন্যও এই কথা। যখন ঝিরিঝিরি সমীরণ বহে, তখন উহার প্রতিকূলে, ঐ বাতাসের গতি বুঝিয়া, সেইরূপ গতিতে বক্ষস্থল সোজা করিয়া, মুক্ত স্থানে ভ্রমণ করা ফুস্‌ফুসের রোগীদের পক্ষে ভাল। এরূপ রোগীরা যেন গায়ে বেশ করিয়া কাপড় মুড়িয়া বাহির হয়। দুর্গন্ধময়, কিম্বা ঘরের ভার বাতাস, কিম্বা ধূলা, কি কয়লার ধূমপূর্ণ বাতাস কাসির রোগীর পক্ষে একেকালীন ভাল নহে। এসেন্সের গন্ধও উহাদের পক্ষে অপকারী।

প্রকৃতির ভাণ্ডারে যত রত্ন আছে, সকলকার মধ্যে আমাদের বায়ুকেই সুলভ বলিয়া মনে হয়; এই সহজপ্রাপ্য জিনিষই আমরা আরোগ্য করিবার মূল উপাদান বলিয়া ধরিয়াছি, এমন কি, বায়ুকেই আমরা আয়ুঃ কহিয়া থাকি। রোগ মাত্রেই বিশুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বায়ু বলিতে, বায়ুটা যে দোষ ছাড়া, ইহা আপনারা বুঝেন। সচরাচর গ্রামে বা ঘরে এ বায়ু খুব কমই থাকে, সেই জন্য বাহিরে ইহা পাইবার জন্য যাইতে হয়। রোগীর উপর বায়ুর প্রয়োগ বড় হিসাবের কাজ;

সর্ব্বদা রোগীকে বায়ুর ভিতর রাখিতে হইবে, কিন্তু দেখিতে হইবে, বায়ুর জন্য রোগীর কোন কষ্ট না হয়। কষ্ট যে ব্যারামের লক্ষণ, তাহা জানেন; ব্যারাম সারাইতে গিয়া আর এক ব্যারামের ভিতর গিয়া পৌঁছান, আমাদের এককালীন মত নয়, আরাম লাগে এমনি করিয়া রোগীর গায়ে সর্ব্বদা বায়ু লাগাইতে হইবে। সকল সময় রোগীকে বাহিরে লওয়া চলিবে না, আর এমন রোগী আছে, তাহাকে স্থানান্তরিত করা যায় না, সে স্থলে বাড়ী ঘর এমন করিতে হইবে যে, তাহাতে বিশুদ্ধ বাতাস আসে। কোনরূপ দুর্গন্ধ যেন না হয়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। রাত্রি বলুন—এমন কি শীতের রাত্রিতেও বাতাস লাগাইতে হইবে, জল, ঝড়, সকল সময়েই কেবলমাত্র রোগীর শরীরের উপর বাতাস লাগানতে কর্ত্তব্য শেষ হইল না, শরীরের অভ্যন্তরে বেশ বাতাস যাওয়া আসা করিতেছে, তাহা দেখিতে হইবে। বিশুদ্ধ বাতাসের গুণ ত আপনারা জানেন, শরীরের ভিতর একটী কৃমি কত দিন থাকিতে পারে, কারণ সেখানে অবিশুদ্ধ বাতাসে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে, যেমন উহা বাহিরে আসে, অমনি বাহিরের বায়ুতে উহা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়, কারণ বাহিরের বায়ু যেমনই হউক, অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ত বটে। ব্যাধির জীবানু মাত্রেই অবিশুদ্ধ বায়ুতে সঞ্জীবিত থাকে, বিশুদ্ধ বায়ুর সংস্রবে গতায়ুঃ হয়, এইজন্য ব্যাধিগ্রস্ত মানবের ভিতর যে সকল ব্যাধি বীজানু আছে, উহাদের হনন করিবার জন্য ভিতরে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করান দরকার। ভাল বাতাসে থাকিতে

হইবে, আর সম্ভবমত কম করিয়া খাইতে হইবে, কম খাওয়াতে যে বাতাস সহজে ভিতরে প্রবেশ করে, তথায় গিয়া কার্য্যকারী হয়, ইহা বুঝিয়া দেখার দরকার।

উদরপূর্ণ থাকিলে, বায়ু কতটুকু থাকিতে পারে, আর উদর অর্দ্ধ পূর্ণ থাকিলে, বায়ু কতখানি থাকিতে পারে, তাহা আপনারা সহজেই বুঝিতে পারেন, কারণ যেখানে শূন্যতা, সেইখানেই বায়ুর অধিকার; আর বিশুদ্ধ বায়ু যেখানে, উপযুক্ত পচন ক্রিয়াও সেখানে হইয়া থাকে, একটী জিনিষের কতকটা বাহিরে রাখুন, কতকটা বেশ বোতলে আঁটিয়া ছিপি দিয়া রাখুন, বাহিরের জিনিষটা ক্রমশঃ অন্য রকম হইয়া যাইবে, আর বোতলের জিনিষ যেমনকার তেমনি থাকিবে। আধা পেট খাওয়াতে খাওয়ার জিনিষ পচিতে পাইল এবং পচন যে ভুক্ত জিনিষের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা আপনাদিগকে বোধ হয় বলিতে হইবে না। পূর্ব্বোক্ত উদাহরণের দ্বারা বুঝিতে পারিবেন, ভরা পেটে খাওয়ায় কি দোষ। ভরা পেটে খাওয়াতে বায়ু উর্দ্ধ হয়, তখন মুখে নাকে অত্যন্ত শ্বাস বয়। শ্বাসটাকে বেশ সরল রাখিবার চেষ্টা করিতে হয়। যেমন উপযুক্ত সন্তান, আলস্য পরবশ হইলে, বৃদ্ধ পিতাকে খাটিয়া সংসার নির্ব্বাহ করিতে হয়, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের শ্বাস যন্ত্রের অবস্থাও তেমনি হইয়া থাকে। প্রকৃত শ্বাস যন্ত্র হইতেছে—নাসিকা, ব্যাধিগ্রস্ত লোকের নাসিকা কম কার্য্যকারী হওয়াতে, মুখে উহার অভাব পূরণ করিয়া থাকে, রাত্রিকালে, এমন কি, দিনেও রোগীকে হা

করিয়া শ্বাস লইতে দেখা যায়। শ্বাস সরল থাকিলে, আদান-প্রদান বেশ চলিতে থাকে, বাহিরের বাতাস ভিতরে পৌঁছায় ও ভিতরের বাতাস বাহির হইয়া আসে, এ দুইটার যে দরকার তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শারীরিক ক্রিয়া উর্দ্ধ হওয়াটা ভাল নহে, বড় দুইটি নিষ্ক্রমণের দ্বার শরীরের নিম্নভাগে থাকা সত্ত্বেও উহা উর্দ্ধগামী হয়, ইহা ব্যাধি হইলে হইয়া থাকে, এখানে শ্লেষ্মা ও বমনাদির কথা বলা যাইতেছে।

সর্পাঘাতে সর্পের বিষে বায়ু সংস্রব হয় না, সেই জন্য এত কার্য্যকারী হয়। যদি কোন প্রকারে বায়ু সংস্রব হইতে পায়, তবে বিষ-দোষ হ্রাস হইয়া যায়। আজ কাল যে ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইতেছে, উহাতেও বায়ু সংস্রব হয় না বলিয়া খাওয়ার ঔষধ অপেক্ষা কার্য্যকারী হয়। মাতৃ-স্তন্যেরও ঐ ধারা, ছেলের মুখে মায়ের স্তন গিয়া পরাতে, বায়ুর সংস্রব হয় না, তাহাতে স্তনের দুধের যে একটী অপার্থিব গুণ থাকে, তাহা শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপ অনেক ক্ষেত্রে, বায়ুর উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতা বেশী। স্থূল দৃষ্টিতে যাহা বোঝা যায়, তাহাই লিখিত হইল। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে কোথাও বায়ুর শূন্যতা পরিদৃষ্ট হয় না।

* * * * *

রৌদ্রের উত্তাপ, বিশেষ শীতের ; দিনের ও চাঁদের আলো, এ গুলিও রোগীর উপর প্রয়োগ করিতে হয়। সকল প্রয়োগই রোগীকে সহাইয়া করিতে হয়, রোগী যেন সবটাতেই আরাম

বোধ করে। কষ্ট যেমন রোগের লক্ষণ, আরামটা তেমনি আরোগ্যের লক্ষণ। রোগী আরাম চাহিলে, তাহাকে আরাম দিতে হইবে, আরামটা ঠিক আরাম কিনা, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। অনেকগুলা এমন আরাম আছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে আরাম নহে; মনে করুন, রোগী একটু সুঘ্রাণ নিতে চাহিল, আপনি এসেন্স দিলেন, এসেন্সে যেমন সুঘ্রাণ দিতে লাগিল, অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটী তীব্রত্বও ক্ষীণভাবে আসিতে লাগিল, ঐ তীব্রত্বটুকু কষ্টদায়ী হয়, এখানে আপনার ফুল দেওয়া উচিত, কারণ উহা কোমল, শীতল ও সুগন্ধদায়ী। রোগী যদি জলের ব্যবহার করিতে চায়, তবে তাহাকে তাহা দিতে হইবে। রোগীরা অনেক স্থলেই জ্ঞানে কম থাকে, কারণ জ্ঞানের লোপ ও বিকৃতি, রোগ হইলেই হইয়া থাকে, সেই জন্য একজন বোদ্ধা লোক সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকা চাই।

* * * * *

প্রয়োগের নিয়মগুলি শুধু পুস্তক পাঠ করিয়া নিজে নিজে করিবেন না। যদি প্রাকৃতিক চিকিৎসায় চলিতে ইচ্ছা করেন, আগে ব্যবস্থিত হইয়া, তারপর পুস্তকের নিয়ম অনুসারে চলিবেন, কারণ রোগীর অবস্থা অনুসারে, কোন রোগীর কোন্ কোন্ প্রয়োগ লওয়া দরকার, তাহা বিবেচনা করিতে হয়।

ব্যাধিত ব্যক্তি, প্রাকৃতিক চিকিৎসা মতে, চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে সকল কাজ ত্যাগ করিয়া, প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপকের ব্যবস্থানুসারে দিনযাপন করিতে হইবে। তবে

সামান্য ব্যাধিতে নিজের কার্য্য চালাইয়া, প্রাকৃতিক বিধি পালন করিতে পারা যায়। প্রয়োগের অধ্যায়ে, যে প্রয়োগগুলির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধাংশ লুই কোয়ানের প্রবর্ত্তিত প্রয়োগগুলি পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রয়োগগুলি পাশ্চাত্য দেশানুরূপ করিয়া বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, আমরা তাহাদিগকে বঙ্গদেশের অবস্থা বিবেচনা করিয়া লিখিয়াছি। এই যা প্রভেদ।

নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম।

—:*:—

রাত্রির শেষে, পাখীরা যখন ডাকিয়া উঠে, তখনই শয্যাত্যাগ করিতে হয়; পাখীর ডাকই, প্রকৃতির, মানুষের ঘুম ভাঙ্গাইবার ডাক। ঘুমন্ত মানুষের অপেক্ষা জাগরিত মানুষের উপর বাহ্য প্রকৃতির ক্ষমতা অধিক। পাখীর গান, ভোরের দৃশ্য, প্রভাত বায়ু, এই সকল বাহ্য প্রকৃতি; আর শারীরিক আভ্যন্তরিণ ও অদৃশ্য ক্রিয়া অন্তপ্র্কৃতিতে করে। বেলা হইলে উঠিলে, শরীরের কষ্টকর ভাব হয়, আর মনঃকষ্ট ও লজ্জাও বোধ হয়, এ সকল মানবের উপর প্রকৃতির শাসন। সুস্থ লোকে রাত্রির শেষে ও ভোরে, পাঠ ও কাজ করিতে পারেন, অসুস্থ লোকের ঐ সময় ভাল এবং অল্প চিন্তা করিয়া ও ভ্রমণাদি লঘু পরিশ্রম করিয়া কাটান উচিত। যাহারা খুব অসুস্থ, নিশ্চিন্ত ও সুস্থির হইয়া থাকাই ঐ সময় তাহাদের উচিত। প্রাতরুত্থান ব্যাধি আরোগ্যের সুন্দর উপায়। ইহা পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সকল ঋতুতেই সকালে উঠার দরকার। অনেকে পরের কথায় ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় করেন, কিন্তু সাহস করিয়া প্রাতরুত্থিত হইলে, তাঁহাদের কাল্পনিক ভয়ের বিপরীত ফল ফলিতে দেখিবেন।

আঁধার আঁধার থাকিতে, গাছের তলায় শৌচে যাওয়া উচিত। মল না দেখার জন্য অন্ধকার কথার উল্লেখ করিলাম,

মল দেখাতে মনে বিকৃত ভাবের উদয় হয় এবং সেই মানসিক বিকৃতিতে স্নায়ু মণ্ডল আলোড়িত হয়। গাছতলায় গাছের স্বাভাবিক গরমও পাওয়া যায়, বাতাসও কিছু কিছু লাগে, এইজন্য অসুস্থ লোকের গাছতলায় যাওয়া উচিত। বাহ্যের ইচ্ছা না হইলে, শুধু নিয়ম রক্ষা করিবার জন্য, বসিয়া থাকা ভাল নয়। কোন স্বাভাবিক কার্য্যই বন্ধ করিতে নাই। বাহ্য কিম্বা প্রস্রাবের বেগ হইলে, অন্য হাজার কাজ ত্যাগ করিয়া, তাহা সম্পন্ন করিবেন। এইরূপ বায়ু নিঃসরণ, কাসি, হাঁচি, কিছুরই গতিরোধ করিতে নাই। সভাসমিতেতে দেখিতে পাই, অনেকে কাসি ও হাঁচি চাপিয়া রাখেন। ইহা কি ভাল? গা বমি বমি করিলে, এটা ওটা খাইয়া বমন বারণ করাও তদ্রূপ। শৌচের সময় তাড়াতাড়ি করিতে নাই; বেগাদি দিতেও নাই. বেগ দিলে আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলি আহত হয়। যন্ত্রের দোষ হইলে, হজম ভাল হয় না, তাই কোষ্ঠশুদ্ধিরও দোষ ঘটে। কোষ্ঠশুদ্ধি না হইলে এক আধ দিন সহ্য করিয়া থাকিবেন, তারপর আপনিই হইবে। পেটের অসুখ হইলে কখন ঔষধের দ্বারা বাহ্য বন্ধ করিবেন না, বরং খাওয়া বন্ধ করিবেন। যাহার শরীরে ব্যাধি-পদার্থ আছে, দ্রুতপদে তাহাকে বাহ্যে যাইতে হয়। কিম্বা কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া সে ভোগে, তাহার মলে বড় দুর্গন্ধ; মল হয় তরল, নয় শক্ত ও শুষ্ক হয়; আর বাহ্যে শেষ হইলে, মনে হয়, বাহ্যে ভাল হইল না, আরও হইত এবং গুহ্যদ্বারে মল লাগিয়া থাকে, কাহারও কাহারও গুহ্যদ্বার

জ্বালা করে। অসুস্থ লোকের আবদ্ধ মলের রং কাল হয়, আর অজীর্ণ মলের রং সাদাটে বা হল্‌দে হয়। শ্লেষ্মার মত মল পড়া ভাল, তাহাতে সঞ্চিত ব্যাধি-পদার্থ অর্থাৎ আম নির্গত হইতেছে, জানিতে হইবে।

ব্যাধি-পদার্থ কথাটা বড়, এইজন্য উহাকে স্থানে স্থানে মল নামে অভিহিত করিয়াছি, মলের বিশেষ অর্থ পুরীষ, কিন্তু সাধারণ অর্থ শরীরের যে কোন মল। শরীরের একস্থানে বাত জমিয়া উঁচু হইয়া আছে, ঐ বাতকে মল বা মলীয়-পদার্থ বলা যায়। যে জীবের গুহ্যদ্বারের ভিতরের মলাধারের আকৃতি যেমন, তাহার মলের আকৃতিও তেমনি হয়। স্বাভাবিক মল গরুর পাকান পাকান, ছাগলের গুঁটিগুঁটি, ইত্যাদি। মানবের স্বাভাবিক মলের চেহারা লম্বা (দৈর্ঘ্যে) ও প্রায় গোলাকার (বেড়ে)। ঐ মলের রং কটা কটা, আর মলের বাহিরটা তৈলাক্ত। সে মলে বেশী দুর্গ্রাণও ছাড়িবে না, কিম্বা ভক্ষিত কোন পদার্থ, তদবস্থায় দেখা দিবে না। বাঙ্গালীর পায়খানা জীবন্ত নরক, দুষ্ট ও তীব্র গন্ধ, কষ্টদর্শন আকৃতি, বায়ুশূন্যতা ও অন্ধকার ভাব, সর্ব্বইন্দ্রিয়কে এককালীন আলোড়িত করিয়া ব্যাধির কারণ হয়। সহরবাসীর ইহা এক মাত্র শৌচের স্থান; নাগরিকেরা ২।১ মাইল গিয়া শৌচ ক্রিয়া করিতে আলস্য বোধ করে; কিন্তু পশ্চিম দেশীয়েরা কেহ কেহ আনন্দ সহকারে এ কষ্টটুকু স্বীকার করে। স্বাভাবিক প্রস্রাবের বেশী বেগ হয় না, পরিমাণে কম কি বেশী হইবে না, রং সাদা হইবে, প্রস্রাবের

স্থান শুকাইলে দুর্গন্ধ বেশী হইবে না, প্রস্রাব করার পর বেশী টোপে টোপে পড়িবে না। অসুস্থ লোকের মলীয় প্রস্রাব হওয়া ভাল। উহা লাল রং হইবে এবং ঘন হইবে, এরূপ প্রস্রাব হইলে, শরীরে আরাম বোধ হইবে। মাটির উপর ক্লেদ (মল মূত্রাদি) পড়িলে, রোগের কারণ কম হয় এবং দুর্গন্ধও কম হয়; ইটে বাঁধা ও সিমেণ্টের উপর পড়িলে, পূর্ব্বোক্ত উভয় দোষ বেশী হয়, এইজন্য এই সকল স্থান সতত পরিস্কৃত করা উচিত। মাটিতে দূষিত পদার্থ পড়িলে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয় ও ঊৰ্দ্ধগতিতে অল্পই দূষিত বাষ্প উঠে। পাকা কিম্বা বাঁধা স্থানে নিম্ন-গতি রহিত হইয়া, কেবলিই ঊর্দ্ধ-গতিতে বাষ্প উঠিতে থাকে এবং বায়ুকে দূষিত করে। মাটি "সর্ব্বং সহা", পৃথিবী অনেক দোষ সারিয়া লইতে পারে।

মুখ প্রক্ষালন, দন্তধাবন জীব-জগতে নাই। জীব অস্বাভাবিক আহারও করে না, ও সকলের দরকারও হয় না। তাহাদের মুখে দুর্গন্ধ হয় না, দাঁত সতত চক্‌চক্ করে ও জিহ্বাতে পলি পড়ে না। মানুষের এ সকল কাজ করা, অর্থাৎ মুখাদি ধোওয়া বিশেষ দরকার। সূর্য্য উদয়ের পূর্ব্বে, এ কাজ করিতে হয়। নিজের বা অন্যের, এ সকল ক্লেদ নিস্কৃতি দেখা ভাল হয় না। ব্যাধিযুক্ত দাঁতে পাথরের মত চটা উঠে ও খাদ্য দ্রব্যের ভগ্নাংশ প্রবিষ্ট হয়, কাহারও কাহারও বা দাঁতের গোঁড়া দিয়া রক্ত পড়ে। ভোজনের সময় চর্ব্বণ বিশেষরূপে না করাতে এ সকল দোষ হয়, রীতিমত চর্ব্বণ করিলে, দাঁতও ভাল থাকে, খাদ্যও

ভাল জীর্ণ হয়। আহারের পর যে আমরা পান চিবাই, উহা আহারকালীন চর্ব্বণের ত্রুটি সংশোধন উদ্দেশ্যে। জীবেরা যেমন জিহ্বা ঘুরাইয়া দাঁতের পরিচ্ছন্নতা সম্পন্ন করে, ঐরূপ করিলে, দন্ত প্রবিষ্ট দ্রব্য বাহির হয় ও জিহ্বা হইতে লালা নির্গত হইয়া, হজমের আনুকূল্য করে। সে যাহা হউক, যিনি শুধু জল দিয়া মুখ পরিস্কার করেন, তিনি যতক্ষণ দন্ত, জিহ্বা প্রভৃতি সম্পূর্ণ পরিষ্কার না হইবে, ততক্ষণ অঙ্গুলি দিয়া ঘর্ষণ করিবেন। ঘর্ষণের দ্বিতীয় উপকারিতা জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি। আহারের পর দন্ত-কাষ্ঠ (খরিকা) করা উচিত, কারণ দাঁতের ভিতর কিছু থাকিলে, হজমের ত্রুটি হয়। দাঁতন কোন খাদ্য ফল গাছের (পেয়ারা প্রভৃতি) হইলেই ভাল হয়। জামালগোঁটার দাঁতন ভাল। Tooth powderএর ব্যবহার করা যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বহির্ভূত, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। মাটি দিয়া ও ছাই দিয়া দন্ত পরিষ্কার করা, tooth powder ব্যবহার করা অপেক্ষা সহস্র গুণে ভাল। সাঁওতালেরা সাপ ব্যাঙ খায় সত্য, কিন্তু উহাদের স্ত্রীলোকেরাও দন্তধাবন করে।

প্রয়োগের অধ্যায়ে স্নান সম্বন্ধে যথেষ্ট লেখা হইয়াছে। আরও যাহা বক্তব্য আছে, তাহাই এক্ষণে সংক্ষেপে লিখিত হইল।

সাদা ত্বক অপেক্ষা কাল ত্বক জল, বাতাস, ঠাণ্ডা, এ সকল বেশী আদর করে। শূকর, মহিষ, জল-কাদায় পড়িয়া থাকিতেই ভালবাসে। চাম্‌ড়ার রং কাল সাদা হওয়া, শীত ও গ্রীষ্মের

তারতম্যে হয়, শীতপ্রধান দেশের লোকের গায়ের রং সাদা, আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকের কাল রং। সে যাহা হউক, সাহেব অপেক্ষা বাঙ্গালীর স্নানটি নিত্য ও অবশ্যকরণীয় জিনিস। আজ কাল যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কাদা মাখিলে লোকে বাতুলাশ্রমের অধিবাসী মনে করিতে পারে। কিন্তু আমাদের পূর্ব্বকর্ত্তারা 'অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে' বলিয়া কাদা মাখিতেন, তাহা কি কাহারও মনে নাই? তাঁহারা বিনা তেলে সকালে ও তেল মাখিয়া দোপরে স্নান করিতেন; এখন দুইবার স্নান করিতে লোকে কত ভয় করে। লোকে তেল বলিয়া বড় ব্যস্ত হয়, কিন্তু অত ব্যস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই; আমরা যে সকল জিনিস খাই, উহা হইতেই শরীরের যতখানি তেলের দরকার, তাহা প্রায় পাওয়া যায়। এই যে সর্ষপ তেল, ইহা মেলেরিয়ার মহৌষধ। সর্ষপ তেল লোম-কূপে থাকিলে, মশকের বিষ পড়িবা মাত্রই উহার বিষ-দোষ নষ্ট হইয়া যায়। কবিরাজ মহাশয়েরা যখন বেদের নিকট হইতে সর্প-বিষ লন, তখন টাট্‌কা ও খাঁটি সরিষার তেলে ঢালিয়া লন, কারণ তেলে বিষের তীব্রতা ক্ষীণ করে।

আমরা বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে সকল কাজ করিতেছি। নাকে সুঘ্রাণ বোধ হইল, চোখে গোলাপী রং দেখিলাম, তেলের সঙ্গে যে বিজ্ঞাপন আছে, তাহাতে দশ কথা মানুষ-ভুলান করিয়া লেখা আছে, তাহা পড়িলাম, আর এমনি পেটে না খাইয়াও এক শিশি তেল কিনিয়া ফেলিলাম। মাথার অসুখ ও চুলের

অকালপক্কতা আরোগ্য হওয়া ও মেয়ে মানুষের চুল বড় হওয়া ও কাল হওয়ার জন্য বাজারের সুগন্ধ ও medicated তেলের এত আদর। বিবাহের মেয়ে কলিকাতা অঞ্চলে যত দেখা যায়, তাহার চার ভাগের তিন ভাগেরই—মাথার চুল খাটো এবং চুলের রং কটাসে। কাল ও ভূ-পৃষ্ঠস্পর্শী চুল দিন দিন দুর্লভ হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে, এ সকল উপকার কি, ঐ সকল তেল হইতে পাওয়া যায়? এ সকল তেল যে উপায়ে preserve করিয়া রাখা হয়, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক। দ্বিতীয় কথা, এমন সব তেল বর্ত্তমান থাকিতে, বাঙ্গালী দিন দিন এত মাথার ব্যারামে ভুগিতেছে কেন? ফল কথা, ঐ সকল তেল এককালীন স্পর্শ না করাই, আমাদের মত। ফলজাত (নারিকেল) ও শস্যজাত (তিল, সর্ষপ) তেল ব্যবহার করা উচিত। যদি সুঘ্রাণ করিবারই সাধ হয়, তবে ফুল মিশাইয়া করা উচিত। স্নানের সময় গামছা দিয়া শরীর ঘর্ষণ করিতে হয়। তৈল মর্দ্দন ও শরীর ঘর্ষণ, এ সকল করার দরকার। মর্দ্দন ও ঘর্ষণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়, বৈদ্যুতিক শক্তিতেই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে, যতই জীবনীশক্তি বৃদ্ধি হইবে, ততই শরীর রোগমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হইবে।

জগতে কোন পদার্থই নিষ্ক্রিয় থাকে না। কেহবা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, কেহবা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। পীড়িত লোকের ব্যাধি-মলেরও ঐ দশা। যখন, পীড়া হইবার পূর্ব্বে, লোকে পীড়ার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পারে না, তখনই ব্যাধি-মল বাড়িয়া যাইতে

থাকে ; আর যখন পীড়া দেখা দেয়, তখনই ব্যাধি-মল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যাহার দেহে ব্যাধি-মল বেশী, তাহার দেহে পীড়া পরিস্ফুট হইয়া পড়িলে ক্রিয়া বেশী হয় ; শরীরের ক্রিয়া করিবার যতখানি ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাটুকু তাহার ব্যাধি-কালে নিযুক্ত থাকে ; তাহার উপর, কতকগুলি খাদ্যবস্তু শরীরে প্রবেশ করাইলে, তাহা লইয়া ক্রিয়া করিবার ক্ষমতা, উক্ত শরীরে অভাব হয়। এই অভাবের জন্য খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহার হয় না। সেই জন্য পীড়া বৃদ্ধিকালে না খাওয়াই ব্যবস্থা। পীড়া যে সময়ে কম থাকে, কিম্বা, অল্প অসুখে, রোগীর পরিমাণে অল্প ও লঘুপাক খাদ্য খাওয়া উচিত। ব্যারামের সময়ে, মুগ কিম্বা মুসূরীর যুষ আমরা অনুমোদন করি। ঐ সময়, প্রত্যেক বেলায় ২।১টি করিয়া পেয়ারা, ২।১টি কচি পেঁপে ইত্যাদি ফল, কিম্বা এক আধ মুঠ করিয়া বুট, মটর আদি শস্য, কিম্বা নরম ও কচি পাতা খাইতে উপদেশ দেই। কাঁচা ফল তীক্ষ্ণ বীর্য্যশালী, তজ্জন্য সামান্য মাত্রায় খাইতে হয়, কাঁচা ফল খাইতে যদি ইচ্ছা না হয়, তবে অর্দ্ধ পক্ক খাইবেন, সুপক্ক, কিম্বা অতি পক্ক ফল গুরুপাক। মুগ, মটর প্রভৃতি শস্যগুলি, জলে ভিজাইয়া নরম করিয়া না লইয়া, এমনই অপরিষ্কার ঝাড়িয়া সামান্য মাত্রায় চিবাইয়া খাওয়া যাইতে পারে। চর্ব্বণ করায় হজমের বিশেষ আনুকূল্য হয়। যাহাদের দাঁত নাই, তাহারাও যেন ঐ সকল জিনিষ গুঁড়া করিয়া মাড়ি নাড়িয়া খান। পশুদের চিবাইয়া খাওয়া অভ্যাস আছে, তাহার উপর তাহারা জাবর কাটে।

ধীরে ধীরে চিবাইয়া খাইলেই, খাদ্য আপনি উদরে প্রবিষ্ট হয়, গিলিতে হয় না। জিনিষ আধ-চেবা করিয়া গিলিয়া খাইলে, চিবাইয়া গুঁড়া করিবে কে? পেটের ভিতর যে সকল যন্ত্র আছে, তাহাদের কি দাঁত আছে, যে তাহারা চিবাইয়া গুঁড়া করিয়া দিবে? বুট, মটর বিস্বাদ খাদ্য নহে, উপরন্তু একটু বেশ সুঘ্রাণ আছে। কাঁচা তরকারীও খাওয়া যাইতে পারে। কাঁচা বেগুন, কি পটোল, কি লাউ-কুমরা, এ সকলে তৃষ্ণা নিবারণ করে, খাইতেও যতখানি কষ্টকর মনে করা যায়, তাহার এক শতাংশ কষ্টকর নহে। কাঁচা তুলসীর পাতা কত সুঘ্রাণ। সময়ে তিক্ত খাইতে ইচ্ছা করে, তখন কচি লতির ডোগা চিবাইতে পারেন। ব্যাধিত ব্যক্তির তিক্ত বড় মিষ্ট বোধ হয়। তিক্তের ধারা হইতেছে যে, যতই ব্যক্তিবিশেষের বয়স হইবে, ততই সেই ব্যক্তির নিকট তিক্ত আদরের হইবে। তিক্তের সঙ্গে অম্লের বিরুদ্ধসম্বন্ধ, যতই কম বয়স থাকিবে, ততই অম্ল প্রিয় বোধ হইবে, বয়স হইলে অম্ল দাঁতগুলিকে অবশ করিয়া দেয়। এ সকল পথ্য এককালীন উদর পূরিয়া খাইবেন না। সামান্য সামান্য মাত্রায় ২।৪ ঘণ্টা পর পর খাইবেন। পৃথিবীতে অপরাপর প্রাণীর জলই এক মাত্র পানীয়, মনুষ্যেরও তাহাই হওয়া উচিত। যখনই তৃষ্ণা পাইবে, তৃষ্ণা মিটে এই পরিমাণ, ঠাণ্ডা ও কাঁচা জল খাইবেন।

ফল-তরকারী যাহাই বলুন না, সকলেরই ভাল মন্দ আছে। মৎস্য-মাংস ত্যাগীরা নিরামিষ আহারী বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন!

কিন্তু ফল-তরকারীর মধ্যেও আমিষ নিরামিষ আছে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়িতারা এ তত্ত্ব সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থায় অনেক ফল-তরকারী যেমন পিঁয়াজ খাওয়া নিষিদ্ধ। সারদার উদ্যানের অমৃত ফল আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry), এই পাশ্চাত্য রসায়ন আয়ত্ত করিলে, আমাদের মহদোপকার সাধিত হইতে পারে। রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিলে মাংসের ভিতর যে আপত্তিজনক পদার্থ (objectionable ingredient) পাওয়া যায়, ফল-তরকারীতেও তাহা পাওয়া গিয়া থাকে। ইহা হইতে দেখিতে পাইলেন, আমিষ ত্যাগ করিয়া নিরামিষাশী হইলেও রক্ষা নাই, ফল-তরকারীও বাছবিচ করিয়া খাইতে হয়। রোগীর আহার যত সাত্ত্বিক ভাবের হয়, ততই ভাল।

সাগু পথ্যটা কতকটা ভাল। বার্লি, এরারুট ভাল নহে, কারণ ইহাতে অন্য গুঁড়া ভেজাল চলিতে পারে। টিনে করা, বিদেশ আমদানী বার্লি প্রভৃতি রোদ বাতাসও পায় না, আর দিন গিয়া 'বাসি' হয়, তার উপর, খারাপ টিন হইলে, টিনের একটা ধাতব দোষ, ঐ সকল খাদ্যে প্রবিষ্ট হয়। বিস্কুটও ভাজা জিনিষ, উপরন্তু পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি হয়। পূর্ব্বে খইয়ের মণ্ড রোগীকে দেওয়া হইত, তাহারও অনুমোদন করা যায়। কিস্‌মিস্‌, সেও, নাসপাতি প্রভৃতি ও দেশজাত পেয়ারা, আনারস প্রভৃতি তুলনায় অনেক ভাল। সোডা, লেমনেড ছেলেভুলান ও ঔষধ মিশ্রিত পানীয়, ইহার কি করিয়া অনুমোদন করি?

গরম জল সোঁদাগন্ধযুক্ত ও গুরুপাক। গরম জলকে ঠাণ্ডা করিয়া পান করার ব্যবস্থা।

আহারের পর ঘুমাইলে, পরিপাকে দোষ ঘটে। বুক, পেট খাড়া থাকিলে, যাহা খাওয়া যায়, তাহা আপনি ভারত্ব প্রভাবে উদরে নামিয়া যায়, এই জন্য খাওয়ার পর হাঁটু গাড়িয়া রাজাসনে বসার নিয়ম এখনও কেহ কেহ করেন। শুইলে পূর্ব্বোক্ত মাধ্যাকর্ষণের উপকারিতা পাওয়া যায় না। যদি শোয়া যায়, চিত হইয়া শোয়া উচিত, পাশ ও উপুর হইয়া শুইলে, যন্ত্রেরা চাপ পায়। এই জন্য ছড়া আছে—"খেয়ে চিত, না খেয়ে কাত। উপুর হয়ে কাটাই রাত।" খাওয়ার পর শোয়াতে হজমের যে বিশেষ দোষ ঘটে, তাহা আরও একটু প্রণিধান করিয়া শুনুন। জাগরণে শরীরের যে শক্তি ক্রিয়া করে, নিদ্রায় তাহার বিপরীত শক্তি ক্রিয়া করিয়া থাকে। জোয়ারের ও ভাঁটার শক্তির প্রভেদের ন্যায় নিদ্রা জাগরণের শক্তির প্রভেদ। জাগরণ কালে, খাদ্যাদি যাহা বাহির হইতে শরীরে প্রবিষ্ট হয়, তাহারই পাচন ক্রিয়া হয়; নিদ্রাকালে শরীরস্থ অপ্রয়োজনীয় মল বাহিরে আসে, যথা—লালা, পেঁচটি প্রভৃতি। জাগরণের অন্তর্গতি, নিদ্রায় বহির্গতি। অন্তর্গতি ও বহির্গতি দুইটি—বিরুদ্ধভাবের জিনিষ। গতিকেই খাইয়া ঘুমাইলে বহির্গতি প্রবল হইয়া উঠে, অন্তর্গতি কম কিম্বা স্থগিত হয়, ভক্ষিত খাদ্য ধীরে ধীরে পাক হয়, কিম্বা যেমন তেমনি থাকে। বেশী জলীয় খাদ্য খাইলে খাওয়ার পর ঘুম আসে। এ নিদ্রা স্বাভাবিক নহে, ব্যাধির নিদ্রা।

সহরবাস রোগীর পক্ষে যুক্তিযুক্ত নয়। যেমনই শরীর খারাপ বোধ হইতে লাগিল, অমনই রোগীকে পল্লীগ্রামে আত্মীয়ের বাড়ি চলিয়া যাইতে হয়। রোগের প্রথম প্রথম রোগীরও সামর্থ থাকে, আত্মীয়ের সেবা শুশ্রূষার বেগও পাইতে হয় না। সহরবাসের আগা গোঁড়া দোষ, রোদ বাতাস রীতিমত খেলে না, ড্রেণ ও আবর্জ্জনার গন্ধ, গাড়ি ঘোড়ার শব্দ ও মানুষের কোলাহল, ইত্যাদি। সহরের কলের জল, পল্লীগ্রামের নদী, পুকুর, কুঁয়ার জল হইতে ভাল কিসের ? সহরের কলের জল, সহরের নদ্যাদির চেয়ে ভাল এই মাত্র, কারণ এই সকল নদ্যাদিতে সহরের ক্লেদ মাটি চুয়াইয়া পড়ে ও লোকে তাহাতে আবিল ধোয়। কলের জল রোদ বাতাস বিহীন—stockএ ও পাইপে থাকে ; দ্বিতীয়তঃ ধাতু নির্ম্মিত reservoirএ থাকে, তাহাতে রৌদ্রে উত্তপ্ত reservoirএ ও জলে chemical action হইয়া জল দূষিত হয়।

নাচার হইলেই nature, যখন রোগী নাচার হয়, ডাক্তার নাচার হয়, ঔষধ নাচার হয়, তখনিই nature। যখন ঔষধে, ডাক্তারে অসুখ ভাল করিতে পারিল না, তখনই তাহাকে বিনা ঔষধে, natureএর উপর ফেলিয়া রাখা হইল। কিম্বা প্রকৃতির লীলাভূমিতে স্থান পরিবর্ত্তন করিবার জন্য পাঠান হইল। যখন ঔষধে, চিকিৎসকে অপারগ, তখন প্রকৃতি পারগা হইলেন, অর্থাৎ প্রকৃতি অসুখ কঠিন হইলে পারগা হইলেন। যিনি কঠিন সারাইতে পারেন, তিনি সহজ সারাইতে কি পারেন না ?

যে দশ মাইল হাঁটিতে পারে, সে কি দুই মাইল হাঁটিতে পারে না? তাই বলি, প্রথম হইতেই জননী প্রকৃতির শ্রীচরণে আত্ম-সমর্পণ করুন, তিনি মা, তাঁহার অবশ্যই কৃপা হইবে। রোদ হইল, জল হইল, ঠাণ্ডা পড়িল, কেবলই ঢাকো, ঢাকো, আত্ম-গোপন! এ কি ভাল? হাজির পেয়াদার গুণাগার নাই, যেমনই অসুখ হইবে, প্রকৃতি-সমাগম করুন, রোগ অবশ্যই আরোগ্য হইবে। পল্লীগ্রামবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"লণ্ডন সহরে পার নামক এক সাহেবের মৃত্যু হইয়াছিল, একশত তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে। লণ্ডনে ইহার বাস নহে,—বাস ছিল মফঃস্বলে। অধিকাংশ বয়স পার সাহেব মফঃস্বলেই কাটাইয়াছিল। মোটা রুটি প্রভৃতিই ইহার খাদ্য ছিল। কিন্তু লণ্ডনে আসিয়া পার সাহেব প্রলোভনে পড়িয়া মদ ধরিল, কেবল মদ নহে—অন্যান্য আহার্য্যেও বিলাসিতা বাড়িল। ফলে আয়ুঃক্ষয় হইল অনতিবিলম্বে। তদানীন্তন সম্রাটের আদেশে একজন বড় ডাক্তার পার সাহেবের শব-ব্যবচ্ছেদে,—পাকস্থলী পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই ডাক্তার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন,—সহরের অবিশুদ্ধ জল বায়ু এবং আহার্য্য পরিবর্ত্তনই পার সাহেবের স্বাস্থ্য ভঙ্গের প্রধান কারণ।"

"স্পেনের রাজধানী মাদরিদের নিকটবর্ত্তী এক গ্রামে আজ আট বৎসর কাল কাহারও মৃত্যু ঘটে নাই। সংবাদ সুখের বটে, কিন্তু গিরজার পাদরির পক্ষে কতকটা দুঃখের, তাঁহার আয়

কমিয়াছে, তাঁহাকে অন্য কর্ম্ম লইতে হইয়াছে ; কবর-খনকগণ বাগানের কার্য্যে লাগিয়া গিয়াছে ; কবরভূমিতে তরকারীর বাগান বসিয়াছে !”

ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, যে কাজ করিয়া দিনপাত করেন, তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে, কিম্বা শরীরে কষ্ট বোধ না হয়, এতটুকু কাজ করিতে পারেন। মানসিক কার্য্য, কি অধ্যয়ন যত না করিতে পারা যায়, ততই ভাল। শারীরিক কার্য্যের মধ্যে, নিজের দৈনিক কাজ নিজে করিতে পারিলেই ভাল, অন্য কাজ এক আধটুকু ধীরে ধীরে সমাপন করিবেন।

* * * * *

জিম্‌নাসটিকটা কিছু পুরাতন পড়িয়া গিয়াছে। ব্যাটবল, ফুটবল, স্যাণ্ডো প্রভৃতির আদর চলিতেছে। এই সকল ব্যায়ামে জগতের কতটা পরিশ্রম বৃথা যাইতেছে, তাহা ভাবিবার কথা। ঘর-গৃহস্থালীর কাজ, বাগানের কাজ, এই সকল করিলে পরিশ্রমও হয়, সংসারের উপকারও হয়। যাহারা ব্যায়াম করে, আর যাহারা জগতের কাজ করে, তাহাদের শারীরিক বলের পার্থক্য বড় বেশী নহে। ব্যায়ামীদের ব্যায়াম না করিলেই শরীর অসুখ করে, আর ব্যায়ামীদের অসুখ হইলে কঠিন অসুখ হয়, ব্যায়ামীরা অল্পজীবীও হয়। আজ স্যাণ্ডো কোথায়, শ্যামাকান্ত, ভীমভবানী কোথায়! খাটের কোঠা কাহার পার হইয়াছে! ফুটবল, ব্যাটবলে নির্দ্দিষ্ট অঙ্গ অনবরত চালিত হয়,

ইহাতে বৈজ্ঞানিক দোষ ঘটে। ব্যায়াম করার উদ্দেশ্য সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে চালিত হওয়া, বিশেষ, যে অঙ্গ দুর্ব্বল ও ক্ষীণ তাহাই অধিক চালিত হইয়া, অন্য স্বাভাবিক অঙ্গের সমান হওয়া। আপনার হাত অপেক্ষা পা সবল, আপনার উচিত হাত দুটিকে পায়ের সমান করিয়া লওয়া, কিন্তু আপনি ফুটবলী হইলেন, কেবলই পায়ের চালনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে আপনার দুই পা আরও সবল হইল, হাত উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়া রহিল। দ্বিতীয় কথা, তাড়াতাড়ি ও অধিক বল প্রয়োগ করিয়া ব্যায়াম করিলে, সে ব্যায়াম স্থায়ী হয় না। আপনার ডান হাতখানাকে যদি এক ঘণ্টায় হাঁটুর কাছ হইতে তুলিয়া ঊর্দ্ধ বাহুর মত করিতে পারেন, আর সেই তোলার সামঞ্জস্য মাত্রায় মাত্রায় ঠিক থাকে, অর্থাৎ তোলার গতি বেশী কম না হইয়া সমান হয়, তবেই আপনার ব্যায়ামের চরম হইল। সাধ্যমত ধীরে ধীরে ব্যায়াম করাই, আমাদের অভিমত। সকল রকম সাংসারিক কাজ করিলে নানা রকমে অঙ্গের চালনা হয় এবং জগতের অনেক শিল্পও শিক্ষা হয়, বাগানের কাজে উদ্ভিদের সহবাসে শরীর সুস্থ থাকে ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। হাট-বাজার করা, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা করা, এ সকলেও ভ্রমণের পরিশ্রম হয়। ভ্রমণ ধীরে ধীরে ও পায়ে সহ্য হয়, এইরূপভাবে করা উচিত। বিলাতের হটন সাহেব ১২ ক্রোশ হাঁটিতেন। আমাদের ভ্রমণেও উদ্দেশ্য থাকিত, আগে কেহ কেহ ১২ ক্রোশ হাঁটিয়া নিত্য প্রাতর্গঙ্গা স্নান করিতেন।

খালি পায় হাঁটিলে ও লোকালয় অপেক্ষা বনপথ ও নদীর ধারে হাঁটিলে ভাল হয়। পূর্ব্বে আমাদের তীর্থ-ভ্রমণ প্রথা ছিল, তাহাতে কত উপকার যে সাধিত হইত, বলা যায় না।

* * * * *

রাত্রে কেরোসিন ব্যতীত অন্য তেলের আলো ব্যবহার করা উচিত। কুপিতে কেরোসিনের ধূম ও গন্ধ। চিম্‌নির কাঁচের প্রধান দোষ চোখের জ্যোতিঃ নষ্ট করা। আলো প্রতিভাত (reflected) হইয়া আসিলেই দোষের হয়। শাস্ত্রে চন্দ্রের দিকে তাকান নিষেধ আছে, চন্দ্র প্রতিভাত পদার্থ (reflected body), চন্দ্রের নিজের কোন আলোক নাই, সূর্য্যের জ্যোতিঃ চন্দ্রে পড়ায় চন্দ্র উজ্জ্বল দেখায়। চিম্‌নির আলোতে পড়ায় ছেলেদের চোখের এত দুর্দ্দশা, ছেলেদের এখন পড়িতে এত উজ্জ্বল আলো লাগে যে, তেলের আলোকে তাহারা ভাল দেখিতে পায় না।

হ্যারিকেন। দৃষ্টি-শক্তি হীনতার ও যক্ষ্মার অন্যতম কারণ হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর হইল, সাধারণ ভাবে, কেরোসিন তৈল বাঙ্গালার গৃহস্থ পরিবারে প্রচলিত হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে গৃহস্থের শয়ন-কক্ষে, রান্নাঘরে, বাহিরের ঘরে, সরিষার তেলের প্রদীপ জ্বলিত। এখনও যে না জ্বলে, তাহা বলিতেছি না, তবে এখন "পিত্তরক্ষা"। মাটির বা টিনের বা কাঁচের 'কুপী' 'ডিবে' 'দোয়াত' 'লম্ফ' নানা দেশে নানা নাম গ্রহণ করিয়া অঢাকা অবস্থায়,

কেরোসিন তেলে উদর পূর্ণ করিয়া, ধূমরাশি উদ্গীরণ করিয়া, গৃহস্থের ঘর, কাপড়, শরীর কাল করিয়া, এখনও জ্বলিয়া থাকে। সস্তা হওয়ায়, হ্যারিকেন লণ্ঠন প্রভৃতির আলো সাধারণ ব্যবহারে আসিতেছে।

শোয়ার ঘরে, পাকের ঘরে, বসিবার ঘরে হ্যারিকেনের ব্যবহার হওয়ায় আমরা অসীম অসুবিধা অনুভব করিতেছি। বৌমারা সারারাত হ্যারিকেনটী কম করিয়া জ্বালিয়া রাখিবেন। ভোরের সময় খুক্ খুক্ করিয়া কাসিবেন। জ্বর হইলেই ডাক্তাররা বুকের শব্দ শুনিয়া বলিবে, যক্ষ্মার পূর্ব্ব লক্ষণ। আপনারা ত জানেন, কেরোসিনের আলো, ডিবেয়, খোলা অবস্থায় জ্বলিলে, বদ্ গ্যাস সৃষ্টি হয়; গ্যাসে মানুষ মরিতেও ত দেখিয়াছেন। হ্যারিকেনেও গ্যাস সৃষ্টি হয়, তবে ধীরে ধীরে, অল্প অল্প।

হ্যারিকেন কম করিয়া জ্বালিয়া রাখিলে, পলিতার দুই পাশ ও মধ্য দিয়া যে গ্যাস উঠে, (উহা প্রজ্জ্বলিত অবস্থায়, অনেকাংশে পুড়িয়া যায়) কম অবস্থায়, উহা ঘরময় গ্যাস ও দুর্গন্ধ বিস্তার করে। ইহা প্রমাণ করিতে আপনাদিগকে কোন ল্যাবোরেটরীতে যাইতে হইবে না। শেষ রাত্রে, বাহিরের মুক্ত বায়ু হইতে, ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেই ঘরের অস্বাভাবিক উত্তাপ ও নাসিকায় বিরক্তিকর ঘ্রাণে প্রত্যক্ষ করিবেন।

ঘরে যে মানুষগুলি আছে, তাহাদের লোমকূপ হইতে ও শ্বাস প্রশ্বাসে, কত ক্লেদ ঘরময় বিস্তৃত হইয়া থাকে; তার উপর

বাপ পিতামহের আমলের জিনিষগুলি হইতে একটী বদ্ আব্-হাওয়া ছাড়ে; রাত্রে গ্যাস সৃষ্টি হওয়ার এতগুলি কারণ যেখানে আছে, সেখানে হ্যারিকেনটী জ্বেলে আবার গ্যাস সৃষ্টি করা কেন? দিয়াশলাই, মাটির দীপ মাথার কাছে রাখুন, দরকার হইলে, হ্যারিকেন জ্বালিয়া লইবেন।

কেরোসিন তেলও ম্যালেরিয়ার মাস্তুত ভাই। কেরোসিন তেল আসার পরে, দেশে দেশে এত অধিক পরিমাণে ম্যালেরিয়ার প্রাধান্য হইয়াছে। দুই কুড়ি বছর আগে, এত মশা ছিল বলিয়া, লোকের মনে হয় না; বেশ মনে হয়, তখন বিনা মশারীতে নিদ্রা যাওয়া যাইত। কেরোসিনে, ম্যালেরিয়ায়, মশায়, একটা নৈকট্যানৈকট্য ভাব আছে। এখন সকল ছেলেই একটী হ্যারিকেন না হইলে, ভোজ্য বস্তু দেখিতে পায় না; পড়ার সময় জোড় আলো করিয়া পড়িতে হয়। যেখানে যাইবে, সঙ্গে ঐ হ্যারিকেন। জীব ও হ্যারিকেনের এত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ হইলে, তবে তাহাকে জোনাকী না বলা যাবে কেন?

অর্থনীতি স্বাস্থ্যনীতি, সব দিক্ দিয়াই লোকসান্। গৃহস্থের ৪০ বৎসরের আগেকার জমাখরচ দেখিয়া তুলনা করিলে, দিয়াশলাইয়ের, কেরোসিনের, লণ্ঠনের ও কাঁচের বাবত দাম অনেক লাগিয়া যাইতেছে। কিন্তু অল্পমতি গৃহস্থ সরিষার তেলের মূল্য দ্বিগুণ, তৃগুণ হইয়াছে বলিয়া আপত্তি করেন। ছেলেরা সব (সর্টসাইটেড্) দৃষ্টিতে ক্ষীণ দাঁড়াইয়া গেল।

সরিষার তেলের প্রদীপে যে পড়া চলে, এখন তাহা কল্পনার বিষয়। ফল কথা, সস্তা কেরোসিন ও সস্তা হ্যারিকেন দুর্ব্বলের ব্যবহার করা উচিত নহে।

* * * * *

রাত্রের আহার কম করিতে হয় এবং আহারের পর অপেক্ষা করিয়া শুইতে হয়; তাহা হইলে, সকালে উঠা যায় ও পরদিন কাজ কর্ম্ম করিতে কষ্ট বোধ হয় না। রাত্রে ঘরে যেন আলো না থাকে এবং ঘরের জানালা দুয়ার যেন কিছু বা সম্পূর্ণ খোলা রাখা হয়। ঘুমের সময় শরীরস্থ দূষিত বায়ু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বাহির হয়, দুয়ার খোলা থাকিলে উহা বাহিরে চলিয়া যায়, দুয়ার বন্ধ থাকিলে শ্বাসের সহিত আবার শরীরে প্রবেশ করে। যাহার শ্বাস প্রশ্বাসের যন্ত্র খারাপ, সে ঘুমের সময় হা করিয়া ঘুমায়, মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস লইয়া থাকে। মুখ বুজিয়া ঘুমানই ঠিক। ঘুম না আসিলে, বাহিরে বেড়ান কি বসিয়া থাকা উচিত। এক রাত্রি ঘুম হইল না, পরের রাত্রিতে হইবে। ৪ মাস ঘুম না হওয়া রোগীও দেখা গিয়াছে। ক্রমান্বয়ে ঘুমায় এদেশে এখনও এমন রোগী দেখা দেয় নাই। Catalapsy অর্থাৎ কুম্ভকর্ণের মত ঘুমান রোগী আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকাতে আছে। স্বপ্নদেখা, দাঁত কড়মড় করা, নাক ডাকা, ব্যাধির লক্ষণ। প্রকৃত ঘুম হইতে উঠার পর মনে হইবে, পুনর্জ্জন্মলাভ হইল।

* * * * *

উপবাসে, ব্যাধির কারণ যে সঞ্চিত মল, তাহার পরিপাক বা লোপ হয়, অর্থাৎ ব্যাধি কমে। রোগযুক্ত ব্যক্তির ক্রমান্বয়ে, কিম্বা মধ্যে মধ্যে উপবাস দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্য। যাহার শরীরে ব্যাধি-মল অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহাকে ২।১টা উপবাস এক সঙ্গে দেওয়ান যাইতে পারে। উপবাসের প্রথম দিনে কষ্টবোধ হইতে পারে, কিন্তু পর দিনে শরীর পাত্‌লা ও আরাম বোধ হইবে। উপবাসের কয়েক দিন কোন কাজ না করিয়া রোদ বাতাস উপভোগ করিতে হয়। লোকে উপবাসের প্রথম দিনের কষ্ট দেখিয়া মনে ধারণা করে, আরও ২।১টা উপবাস দিলে হয়ত মরিয়া যাইবে। কিন্তু এটা ভ্রান্ত-বিশ্বাস। দুঃখই সুখের জনক; কষ্ট সহ্য করিলে তবে সুখভোগ কপালে ঘটে, এই-ই জগতের নিয়ম। আগে কঠিন জ্বরাদি রোগে মাসাবধি পর্য্যন্ত কবিরাজ মহাশয়েরা রোগীকে অনাহারে রাখিতেন। তাহারা এমন সারিয়া উঠিত যে, দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত আর অসুখের মুখ দেখিত না। এখন রোগীকে আদর করিয়া অনেক রকম মুখরোচক খাদ্য দেওয়া হয়। ইহার ফলে, সে রোগটা শীঘ্র সারে বটে, কিন্তু আজীবন বারে বারে ব্যারামে পড়িতে হয় ও অল্প বয়সে ভব-লীলার শেষ হয়। মানুষে সাধারণভাবে দিনযাপন করিয়া যে সামান্য অত্যাচার করে, তাহারই সংশোধনের জন্য শাস্ত্রবেত্তারা বার্ষিক কতগুলি উপবাসের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। আর আমরা জ্ঞানতঃ অজ্ঞানতঃ কত অত্যাচার না করিতেছি। যে সকল ব্যক্তি

বার-মেসে রোগী; যেমন কেহ যক্ষ্মাগ্রস্ত, কি হাঁপানি, কি অর্শে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহাদিগের পাঁজিতে যতগুলি উপবাসের কথা আছে, তাহার একটিও বাদ দেওয়া উচিত নয়। যাহারা মধ্যে মধ্যে ব্যারামে পড়ে, তাদেরও 'পাগলার চৌদ্দ পাগ্‌লীর আট' প্রভৃতি মোটামুটিগুলি করিতে হইবে। ইহাতে শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম ও শারীর ধর্ম্ম উভয়ই পালন করা হইবে।

উপবাসের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে, তজ্জন্য আরও কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। একজন প্রশ্ন করিলেন, ঘড়িতে রোজ দম না দিলে, ঘড়ি বন্ধ হইয়া যাইবে যে। বিনীতের উত্তর—প্রথমতঃ মানুষ ও ঘড়ি এক জিনিষ নহে, দ্বিতীয়তঃ ঘড়িতে দম দেওয়ার উদ্দেশ্য ঘড়ির চলিবার শক্তি করিয়া দেওয়া, কোন ঘড়িতে রোজ দম দিয়া, কোন ঘড়িতে ৭ দিন পর দম দিয়া, এই উদ্দেশ্য সাধন করা হয়। মনুষ্যঘড়িতে কতক্ষণ বা কত দিন পরে দম দিতে হয়, তাহা তলাইয়া ভাবিয়া উত্তর দিবার বিষয়, মনুষ্য-ঘড়িরও ব্যক্তিগত হিসাবে দমের সময়ভেদ করা যাইতে পারে, কারণ সকলের স্প্রিং সমান নহে। দম দেওয়া আর আহার দেওয়া একই কথা, তাহা বিচক্ষণ পাঠক এতক্ষণ বুঝিয়া থাকিবেন। দম পাইলে ঘড়ির কলগুলি চলিতে থাকে, তাহাতেই ঘড়ির সময় রাখা কার্য্য সাধিত হয়; মানুষ আহার করিলেই তাহার শারীরিক ক্রিয়া হইয়া থাকে, তজ্জন্যই সে সকল কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয়। পীড়িত মানুষের শরীরে ব্যাধি-মল থাকে, পূর্ব্বে তাহা আপনাদিগকে বলিয়াছি। আজ

আমি কিছু খাইলাম না, তাই বলিয়া আমার শারীরিক ক্রিয়া বন্ধ থাকিবে না, যন্ত্র সকল নিষ্ক্রিয় রহিবে না। তবে তাহারা কি লইয়া কাজ করিবে? আমার শরীরে যে ব্যাধি-মল আছে, তাহা লইয়া যন্ত্রেরা কাজ করিবে, অন্য দিন দৈনিক আহারীয় লইয়া কার্য্য করিত, ব্যাধি-মল লইয়া কার্য্য করিবার সময় পাইত না, আজ আহারীয় লইয়া কার্য্য করিতে হইতেছে না বলিয়া ব্যাধি-মল লইয়া কার্য্য করিতেছে। মনে করুন, আপনার নানাপ্রকার কর্ম্ম বাহুল্যে, আপনি পত্র লিখিবার সময় পর্য্যন্ত পাইতেছেন না, আজ আপনার কাছারী নাই, নিয়মিত কাজ নাই, আজ এই সকল কর্ত্তব্য সমাধান করিতেছেন। এইরূপ বকেয়া কাজ সারার ন্যায় উপবাসের দিন ব্যাধি-মলের ক্রিয়া হইতেছে। আপনি ১০ টার সময় খান, উপবাসের দিন যেমনই ১০টা বাজিল, অমনই ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, কিছুক্ষণ পর ক্ষুধা পড়িয়া যাইবে। ক্ষুধার উদ্রেক হইল কেন এবং ক্ষুধা চলিয়া গেল কেন, তাহাও বুঝিবার বিষয়। আপনার পূর্ব্ব দিনের আহারীয় পর দিন, অন্য দিনের মত ১০টার মধ্যে পরিপাক হইয়া যথাস্থানে চলিয়া গেল ও ক্ষুধাকোষ খালি পড়িল, তাই ক্ষুধা দেখা দিল। ক্ষুধাকোষ খালি থাকার পর শরীরের অন্যান্য স্থানের আবদ্ধ মল ঐ কোষে আসাতে আবার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল। এই নিবৃত্তির নামই 'পিত্তিপড়া।' পিত্তিপড়ার ভয়ে লোক সকালে উঠিয়া 'চাল-জল' করে। আবদ্ধ মল শরীরের মধ্যে এমন কঠিন হইয়া থাকে যে, উহাকে তরল

করিয়া পাকযন্ত্রের মধ্যে আনিতে শরীরকে বেগ পাইতে হয়। মলের কাঠিন্য ও শরীরের শক্তির অনুপাতে শরীরের ভিতর একটা তোলপাড় হয়। এই তোলপাড়েই আপনি উপবাসের প্রথম প্রথম কেমন একটা কষ্ট বোধ করেন। তারপর মলাংশ পাকস্থলীতে চলিয়া আসিলে ও বাহ্য প্রস্রাব ঘর্ম্ম হইয়া শরীর হইতে নির্গত হইয়া গেলে, উপবাসের আরাম উপভোগ করিবেন। উপবাসের পর ঘন লাল প্রস্রাব হইবে, কারণ ঐ প্রস্রাব মলবাহী। তলপেটে, পায়ের হউক, মাথার হউক, সকল স্থানের মল আপনি চলিয়া আসে। নদীর ধারা যেমন সকল দিক হইতে বহিয়া সাগরে আসিয়া পড়ে, তেমনি ভালমন্দ শরীরে প্রবিষ্ট পদার্থ তলপেটে জমা হয়, আবার তথা হইতে শরীরের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্নরূপে চলিয়া যায়।

উপবাস-চিকিৎসা (fast-cure) অর্থাৎ বিনা ঔষধে ও বিনা অস্ত্রে শুধু উপবাস করাইয়া সকল রোগ আরোগ্য করিবার প্রথা বিলাতে প্রচলিত হইয়াছে। উপবাসকারীর পরীক্ষার একটা দৃষ্টান্ত দেখুন। সিনক্লেয়ার ক্রমান্বয়ে ১২ দিন উপবাস করিয়া কিরূপ ছিলেন।—প্রথম দিন ভয়ঙ্কর ক্ষুধা বোধ হইল। দ্বিতীয় দিন প্রাতেও কিছু ক্ষুধা বোধ হইল, কিন্তু তাহার পরে আর ক্ষুধাবোধ হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে এক সপ্তাহ ধরিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়াছিল। দ্বিতীয় দিনেই তাহা অদৃশ্য হইল। তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে একটা দুর্ব্বলতা ও জড়তার ভাব দেখা দিল বটে, কিন্তু মনটা যেন খুব পরিষ্কার ও সতেজ বলিয়া বোধ হইতে

লাগিল। পঞ্চম দিনের পর তাঁহার অনেকটা সবল বোধ হইল। সে দিন বেশ বেড়াইয়া আসিলেন ও অনেকটা লিখিয়া ফেলিলেন। দ্বাদশ দিনের পর উপবাস ভঙ্গ করিলেন। সেইদিন জীবনে যেন সর্ব্বপ্রথম তিনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করিলেন। মনের শক্তিও যেমন তীক্ষ্ণ বোধ হইতে লাগিল, শারীরিক শ্রমের জন্যও সেইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছা জন্মিতে লাগিল। সিনক্লেয়ার বলেন, "উপবাসে অনন্ত যৌবন লাভ করা যায়।"

আমার দেশবাসীর নিকট নিবেদন যে, তাঁহারা হিন্দু হউন, মুসলমান হউন, খৃষ্টান হউন, সকলে মিলিয়া দেশ প্রচলিত নিয়মের উদ্ধার সাধন করুন। কোনটিকে গোঁড়ামি, কোনটিকে মেয়েলী বলিয়া উপহাস করিবেন না। সকল নিয়মই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়ের ফল। এক হাতে ঐ সকল নিয়ম লউন, এক হাতে আধুনিক বিজ্ঞানরূপ কষ্টি-পাথর লউন; কষিয়া কাহার কি মূল্য নিরূপিত করুন। পরের জিনিষ হাজার ভাল হোক্, আমাদের বংশানুক্রমিক অভ্যাসের ফলে, তাহা আমাদের নিজের জিনিষের মত সুষ্ঠু কখনই হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য আছেন, তাঁহারা পাশ্চাত্য শাস্ত্রের অনুশীলনেই আছেন। পাশ্চাত্যেরা ও আমরা যদি একই শাস্ত্রের অনুশীলন করিব, তবে আমাদের শাস্ত্রের অনুশীলন করিবে কে? কেন হিন্দু রসায়নের কি উদ্ধারসাধন হয় নাই? সকলে একযোগে, এক একটির উদ্ধার করুন।

বিশেষ কথা।

একটি অত্যন্ত পীড়াগ্রস্ত রোগীকে প্রাকৃতিক চিকিৎসার সাহায্যে আরোগ্য করিতে হইলে, তাহার সম্বন্ধে কিরূপ বিধান নির্দ্দিষ্ট করা হয়, তাহারই আলোচনা লিপিবদ্ধ হইল। ব্যারাম, যক্ষ্মা কি বহুমূত্র, বসন্ত কি কলেরা, তাহা আমাদের দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমাদের মনে হয়, ব্যারামের নামকরণ সাধারণ লোকের শুধু বুঝিবার সুগম হইবার জন্য হইয়াছে। এই জন্য প্রাকৃতিক চিকিৎসার চিকিৎসকের ব্যারামের নাম নির্দ্দেশের হাত হইতে অব্যাহতি ঘটিয়াছে বটে, কিন্তু আরও কিছু কঠিন কর্ত্তব্য তাঁহার মস্তকোপরি স্থাপিত আছে।

প্রথমতঃ চিকিৎসককে ভাবিয়া দেখিতে হয়, রোগীকে আরোগ্য করা তাঁহার চিকিৎসার গণ্ডীর ভিতর আছে কিনা, রোগের অবস্থা বিবেচনা করিয়া এটা তাঁহাকে স্থির করিতে হয়। রোগ যক্ষ্মা হইলেই যে, অচিকিৎস্য রোগ বলিয়া রোগীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে, ইহা কোন কথা নহে, যে রোগই হউক না, রোগ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাই দেখিতে হইবে, আর কত দিন হইতে রোগ দেখা দিয়াছে, তাহার পিতৃ মাতামহ কুলের কোন ব্যারাম ছিল কি না, এই সকল বিবেচ্য বিষয়। রোগীকে আরোগ্য করিবার জন্য এগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখার দরকার।

যদি রোগী আরোগ্য না হয়, এমন বুঝিতে পারা যায়, তবুও তাহার চিকিৎসার বিধান করা কর্ত্তব্য,—কারণ যত কাল রোগী বাঁচিয়া থাকে, তত দিন তাহার ব্যাধির লাঘব হয়; আর যখন তাহার প্রাণান্ত হইবে, তখন সে যেন আরামে মরিতে পারে। মরণ কালে যদি আরাম পাইয়া রোগী মরিতে পারে, তখন আপনাদের সকলকেই একবাক্যে বলিতে হইবে—All's well, that ends well!

রোগ মাত্রেই এক। রোগের বাহ্য লক্ষণ ছাড়িয়া দিয়া, শুধু আভ্যন্তরীন্ লক্ষণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। সকল রোগেই শরীরের ভিতর যন্ত্রণা দেখা দিয়া থাকে, এই যন্ত্রণাই রোগের লক্ষণ; এই যন্ত্রণার তারতম্য অনুসারে রোগের কাঠিন্য ও লঘুত্ব নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। রোগের লক্ষণ এক বলিয়া চিকিৎসার নিয়মও একরূপ বিধিবদ্ধ আছে; তবে সহজ রোগে বিধিগুলি যথাসম্ভব সংক্ষেপ করা হয়, কঠিন রোগে উহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইতে হয়, ইহাই পার্থক্য। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আমরা রোগের চিকিৎসা করিতে ইচ্ছা করি না, রোগীর চিকিৎসা করিয়া থাকি। রোগীর চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিতে হয়, কিরূপ অত্যাচার করাতে এই রোগ এতদূর অগ্রসর হইয়াছে। অত্যাচার যদি সহজ হয়, তবে আরোগ্যও সহজে হইবে, আর অত্যাচার যদি নিতান্ত অস্বাভাবিক কোন কিছুতে হইয়া থাকে, তবে রোগ আরোগ্য করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। সাধারণ পেটুকের ব্যারাম,

আহার্য্যবস্তু অধিক পরিমাণে খাওয়াতে হইয়া থাকে, তজ্জন্য সহজ সাধ্য; আর মাতালের চিকিৎসা কঠিন, কারণ তাহা একটী অস্বাভাবিক বস্তু, অধিক পরিমাণে খাওয়াতে হইয়াছে।

ব্যাধি হইলেই তাহা সারানর চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য, কারণ সময় যেমন চলিতে থাকে, ব্যাধিও তেমনি বাড়িয়া যাইতে থাকে। জগতে কোন কিছুই নিষ্ক্রিয় থাকে না, ইহা আপনারা জানেন, যে ব্যাধি আজ এক থাকে, কালে তাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া দেড় হয়। যতদিন যাইয়া ব্যাধির চিকিৎসা করান যায়, ততই ইহা সারাইতে সময় লাগে।

ব্যাধি স্বোপার্জ্জিত হইলে, যত দোষ না হয়, পৈতৃক হইলে ততোধিক দোষ হইয়া থাকে, কারণ তাহাতে বহু সময়ের দরকার হইয়াছে। বাপের জীবনের অর্দ্ধাংশ ঐ ব্যাধি বিদ্যমান ছিল, আবার তুমিও তাহাতেই আজন্ম ভুগিতেছ, তুমি জান, বা না জান। ব্যাধিগ্রস্ত পিতা মাতার সন্তান ব্যাধিগ্রস্ত নিশ্চয়ই হইবে, কিন্তু জন্মাবধি যদি সন্তানের আরোগ্যের চেষ্টা থাকে, তবে সে আরোগ্য হইতে পারে। আরোগ্য হইলে আবার যদি ব্যাধি হয়, তবে তাহা বংশগত বলিয়া আরোপ করিতে পারা যাইবে না, উহা তাহার স্বোপার্জ্জিত। সন্তান ঊর্দ্ধতন দ্বাদশ ব্যক্তি হইতে ভাল মন্দ গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহা যথাক্রমে এই পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী; ব্যাধিরও উত্তরাধিকারিত্ব সন্তান এই বার জন

হইতে পায়। হিন্দু শাস্ত্র এই বার জনের উর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে উপদেশ করেন; পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান সন্তানে যে দ্বাদশটি বীজের অধুনা আবিষ্কার সাধন করিয়াছেন, উহা পূর্ব্বোক্ত ঐ দ্বাদশ ব্যক্তির জীব-সত্ত্বা হইতে সম্ভূত হইয়াছে, ইহা আমাদের মনে হয়

যন্ত্রণা ক্রমশঃ লাঘব করিতে পারিলে, তখন বোঝা যাইবে রোগী আরোগ্যের পথে চলিয়াছে। এমনি করিয়া ধীরে ধীরে দিনে দিনে নিরাময় হয়। বিন্দুতে বিন্দুতে সিন্ধু, এ আপনারা জানেন; ব্যাধি যখন হইয়াছিল, তখন একটু আধটু করিয়া এত বড় হইয়াছে, আবার সারিবার সময়ও একটু আধটু করিয়া সারিবে। হঠাৎ আরোগ্য হওয়া আমাদের মাথায় আসে না, কারণ প্রকৃতির ধারা ঐ ধীর গতিতে, সাগর মরুভূমি হইয়াছে ঐরূপেই; তবে যদি আপনারা বলেন, সাহারার সব জল এক ভূকম্পেই অপসারিত হইয়াছে, তবে লেখক নাচার; কারণ প্রকৃতির ন্যায় ঐরূপ ক্ষমতা মানুষের আছে কিনা, তাহা তিনি বোঝেন না।

যন্ত্রণা ক্রমে কমে যাবে ও আরাম বোধ হবে, পরে কেবলই আরাম বোধ হতে থাকবে; আর সেই লোকটি অনেক দিন বাঁচিবে, এই করতে পারিলেই উপযুক্ত চিকিৎসা হইল। এই গুলি করানও আমরা চিকিৎসকের কর্ত্তব্য মনে করি। আজ এ ব্যারামটী এককালীন সারিয়ে দিলাম, কাল আর একটী ব্যারাম হইল, পরশ্ব রোগী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল, ইহা রোগ চিকিৎসার

নিয়ম নহে। আজ যেটী সারাইয়া দিলাম, সেটী প্রকৃতপক্ষে সারান হইল না, লোকচক্ষুর অগোচর করিয়া ধামা-চাকা দেওয়া হইল, ভিতরে ভিতরে ঐটাই ডালে পল্লবে বাড়িয়া এককালীন মৃত্যু-ফল প্রদান করিয়া থাকে, ইহাই আমাদের অভিমত। হঠাৎ একটী ব্যাধি সৃষ্ট হইয়া মনুষ্যের প্রাণ নিতে পারে না।

এক কথায়, জগতে রোগীর জন্য যে সকল চূড়ান্ত তদ্বির শেষ অবস্থায় লওয়া হইয়া থাকে, তাহাই আমরা প্রথম হইতে লইতে বলিতেছি। যখন রোগ অচিকিৎস্য হয়, তখন বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে, বায়ু পরিবর্ত্তন বলিতে প্রকৃতির রাজ্যে গমন করা,—পাহাড়, খোলা মাঠ, সমুদ্রতীর, ইহাদের পাদমূলে স্বাস্থ্য ভিক্ষা করা। বাপ মা আমাদের জন্ম দিয়াছেন বটে, কিন্তু দণ্ডে দণ্ডে যে আমরা মরিয়া যাই, তখন প্রকৃতি দেবীই বাঁচাইয়া থাকেন। দণ্ডে দণ্ডে আমাদের জীবনীশক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে, দণ্ডে দণ্ডে তিনি আমাদিগকে নবজীবন দিতেছেন। অত্যাচার বিবর্জ্জিত হইয়া, তাঁহার চির আশ্রিত থাকিলে, শত বৎসরের ঊর্দ্ধকালও তিনি কোলে করিয়া থাকেন।

ব্যারাম হয় কিসে ও বাড়ে কিসে, তাহাই বুঝিয়া চলিতে পারিলে, সমনের ভয়ের ত কোনই কারণ থাকিত না, এ আপনারা ছোট-বড় জ্ঞানী-মূর্খ সকলেই জানেন ও বোঝেন, কিন্তু কাজে করেন না, তাই ব্যারাম ও অকাল মরণে দেশ ছাইয়া ফেলিল। আমরা বলি আধিক্যে ব্যারাম হয়, আধিক্যের প্রতি শব্দ Excess ধরা গিয়াছে। শরীরটীকে নড়ান চড়ান বিষয়ে

এককালীন উদাসীন থাকিলে, কি আবশ্যক মনে করিয়া কেবলই নড়িলে চড়িলে, উভয় ক্ষেত্রেই আধিক্য দোষ হইল। আধিক্য দোষ জগতে যা কিছু করা যায়, সকলটাতেই হইয়া থাকে, এই জন্য শকুনীর মত সর্ব্বদা সূক্ষ্ম দৃষ্টি করা আপনার প্রকৃতি করিতে হইবে!

শরীরে আধিক্য হইতেছে কি না, ইহা বুঝিবার জন্য কোন যন্ত্রের দরকার হয় না, শরীর ভিতর হইতে যেমনই আধিক্যের আভাস পায়, অমনই কে কহিয়া উঠে, এই আধিক্য আসিয়াছে, আরও আসিল, আরও, আরও। যে কষ্টের ভাবের কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি, আধিক্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উহা দেখা দিয়া থাকে; আধিক্য যেন প্রকৃত জিনিষ, আর কষ্ট যেন তার ছায়া! এই আপনারা যখন বাড়ি গিয়া আদরে তৈয়ারী রাত্রির আহার করিবেন, তখনই বুঝিতে পারিবেন, আধিক্য জিনিষটী কি? আপনার জিহ্বা বলিবে, বেশ লাগছে, আরও দুখান; চোখ বলিবে, বেশ দেখাচ্ছে আরও কিছু, কাণে হয় ত শুনিতে পাইবেন, পাশে একজন দাঁড়িয়ে আদর করে বল্‌ছেন, ওখান থাকল কেন? তারপর রাত্রে হয় ভাল ঘুম হবে না, সকালে উদ্গার উঠিবে ও পেট ভার হইবে, তখন অসুখ হইয়াছে বলিয়া আব্দার করিতে থাকিবেন। আধিক্যে এমনি করিয়া অসুখ হয়।

অনেকে বলিতে পারেন, শয্যাশায়ী রোগীর কথা বলিতে গিয়া, সামান্য অসুখের নামোল্লেখ কেন করা হইতেছে? এই জন্য হইতেছে, সাধারণ অসুখের অবস্থাটী আপনারা বুঝিয়া

লউন, এই সাধারণ অবস্থা হইতে, তর ও তম মাত্রা কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আমার রোগী তম মাত্রায় গিয়া পৌঁছাইয়াছে, যেন একটী আধিক্য শরীরী হইয়া রহিয়াছে। এই তম মাত্রায় বিশেষ সাবধানতার দরকার, সেখানে চক্ষু কর্ণ আত্মীয় স্বজনের অন্যায় কথা, বিষের কার্য্য করিয়া থাকে, বিষ খাওয়ানতে যে অপকার হইয়া থাকে, তাহাই হয়, ইহাতে ব্যাধি আশঙ্কাজনক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মরণও হইতে পারে।

রোগের চিকিৎসা নয়, রোগীর চিকিৎসা; ইহা আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। রোগী বলিতে ব্যক্তিগত প্রকৃতি, প্রথমতঃ ব্যক্তিগত প্রকৃতির চিকিৎসা করা হয় বলিয়াই ইহার নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা; তারপর আপনি যদিও জানেন না, কিন্তু আপনার ভিতর এক জন চিকিৎসক আছেন, তিনিও বসিয়া নাই, আপনার চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় তিনিও সর্ব্বদা ব্যাপৃত আছেন, ইহাকেই আমরা প্রকৃতি আখ্যাদান করিয়া থাকি, এই ভিতরকার প্রকৃতি বাহিরের প্রকৃতিগুলির অর্থাৎ জল বাতাস আদির সঙ্গে এক যোগ হইয়া, চিকিৎসা করিয়া থাকেন। বাহিরের প্রকৃতি বলিতে, বায়ু, পাখীর গান, সদ্যঃ পক্ব ফলের মিষ্টত্ব, ইত্যাদি। এই ভিতর ও বাহিরের প্রকৃতির 'ফি' দিতে হয় না বলিয়া, ইহাদের মূল্য বোঝেন না। আর ইহাদের মূল্যও নাই; বস্তুতঃ ইহারা অমূল্য। ইহা সে-ই জানে, যে ঔষধ খায় না, শত অত্যাচার করে, শত ব্যারামে মরে, আর যখন এখন-তখন হয়ে পড়ে, তখন ঐ চরণ গিয়ে ধরে! যাহা হউক, এই তিনটি প্রকৃ-

তির এক স্থানে সমন্বয় দেখিয়া, ইহার নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা দিয়াছি।

আধিক্য প্রকৃতিগত; এই যে আজকার রোদ, ইহাতে বাহির হইলে, আমার অসুখ হইবে, কিন্তু একজন চাষার হইবে না, কারণ তাহার প্রকৃতি রোদ সহ্য করা, উহা আমার প্রকৃতি নহে, এই জন্য আজকার রোদ আমাকে আধিক্য দান করিল, কিন্তু তাহার পক্ষে আধিক্যের কার্য্য করিল না।

আধিক্য হইতেছে, ব্যাধি উৎপত্তির কারণ; তাহা হইলে, ব্যাধি নিবৃত্তির কারণ কি, কি করিলে নিরাময় হওয়া যায়; আধিক্যের বিপরীত যাহা, তাহাই ব্যাধি নিবৃত্তির কারণ; সমতাকে আমরা ব্যাধি নিবৃত্তির কারণ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছি। সমতার ইংরাজী প্রতিশব্দ equalisation ধরা গিয়াছে। স্নায়ুমণ্ডলকে স্থির রাখিতে পারিলে, তবে সমতাকে রক্ষা করা যায়। বেশ ধীরতার সহিত শরীর ও মনের যত রকম কাজ আছে, সব সমাধান করিতে হয়, তবে স্নায়ুর প্রবাহ অব্যাহত থাকে। পূর্ব্বে যে শকুনীর দৃষ্টির তুলনা দিয়াছি, সমতার বেলাও তাহারি সাধনার দরকার।

শরীর ও মনের, দুইটির দুই শ্রেণীর ব্যাধি বলিয়া ধরিবার প্রয়োজন নাই, শরীর ও মন অভিন্ন, শরীরে ব্যাধি হইলে, মন তাহাতে ব্যাধিগ্রস্ত হয়, আবার মানসিক ব্যাধি হইলে, দৈহিক পরিবর্ত্তন দেখা গিয়া থাকে। এজন্য শারীরিক ব্যারামেরও কারণ ও কর্ত্তব্য যাহা, মানসিক ব্যারামেরও ঠিক তাই। ব্যাধির

কারণ যে আধিক্য এবং আরোগ্যের কারণ যে সমতা, ইহাদের যাহা ফলাফল, অর্থাৎ কষ্ট ও আরাম, তাহা ত মনই ভোগ করিয়া থাকে। এই জন্য মনই প্রকৃত জিনিষ, উহাই আমি, উহারই চিকিৎসা হয়, উহারই চিকিৎসার জন্য শরীরের চিকিৎসা। যেমন পীড়িত সন্তানের চিকিৎসার জন্য, তাহার মার চিকিৎসার কারণ হয়, সেইরূপ। শরীরের উপর অধুনাতন চিকিৎসা জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে, দেখিতে পাওয়া যায়; তাঁহারা জড় লইয়াই ব্যস্ত আছেন, জড়টী ত চেতনার আধার, চেতনাটীর জন্যই জড়ের দরকার হইয়াছে; চেতনাটা যখন চলিয়া যায়, তখন কি তাঁহারা জড়কে লইয়া কোন কাজ করিতে অগ্রসর হন? সুস্থ লোকের এই চেতনাটী অটুট থাকে, সে যা করবার; তাই ঠিক করে, আর যাহার চেতনা অটুট থাক, তাহার শরীরও স্বাস্থ্যযুক্ত থাকে।

আমি আপনাদের সঙ্গে দশ রকম প্রসঙ্গ করিতেছি, এদিকে আপনাদের যে গমনোন্মুখ রোগীর চিকিৎসার ভার লইয়াছি, তাহার অন্তঃশ্বাস দেখা দিয়াছে। আপনারা stimulant mixture আনিবার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছেন। আপনারা উহাকে ঔষধ দিবা মাত্র, উহার সমস্ত জীবনী-শক্তি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়া, উহাকে আবার সজীবতা প্রদান করিল, আপনারা আনন্দ করিতেছেন, দেখিতে দেখিতে আবার অবসাদ দেখা দিল। এইবার অবসাদের গতি মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করুন। পূর্ব্বে মিনিটে এক মাত্রা করিয়া জীবনীশক্তি ক্ষয়

হইতেছিল, এখন দেড় মাত্রা করিয়া ক্ষয় হইতেছে। এক মাত্রা করিয়া ক্ষয় হইলে, প্রাণ যত সময় তাহার দেহ পিঞ্জরে থাকিত, দেড় মাত্রা করিয়া ক্ষয় হওয়াতে, তাহা অপেক্ষা কম সময় থাকিল। অচিরে হাহাকার উঠিল। আনন্দের পাশাপাশি রোদনের রোল অনেক গৃহস্থই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আধিক্য ব্যারামের কারণ; সুরাতে ষোল আনা রকম আধিক্য, ঘ্রাণে, স্বাদে কত তীব্র, কত কষ্টে উহাকে গলাধঃকরণ করিতে হয়, অত কষ্টের জিনিষও ঔষধ! কুইনাইন অতি তিক্ত, তাহাও ঔষধ! আবার জিহ্বাকে ভোগা দিবার জন্য, উহার গাত্রে মিষ্ট লেপন করা হয়, জিহ্বা না হয় ভুলিল, কিন্তু ভিতরে যে ভবী আছে, সে যে ভুলিবার নয়, তার তুলাদণ্ড মানুষের কৌশলে ওঠে নামে না, যে জিনিষের যা ন্যায্য কাজ তাহাই হইয়া থাকে। Castor-oil খাওয়ান হইতেছে, তাহার ভোক্তাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে, তাহার কোন ব্যাধি হইয়াছে, ব্যাধির লক্ষণ যে কষ্ট, আহার শরীরে তাহা প্রকাশ পাইতেছে, মুখ খেঁচুনি, ঝাঁকাঝাঁকি, এগুলা কি ব্যারাম হলে হয় না? এক ব্যারাম সারাতে, আর এক ব্যারাম করা কেন?

রোগ এক দিনে গঠিত হয় না, রোগের কারণগুলি জমিয়া জমিয়া শরীরে সঞ্চিত থাকে, একদিনে কারণাধীনে রোগ দেখা দেয়; মানবের বুদ্ধি নিতান্ত সীমাবদ্ধ, পূর্ব্বে তাহা বুঝিতে পারে না বলিয়া, বলে, আজ জ্বর হইয়াছে। আচ্ছা, যখন আজ জ্বর দেখা দিয়াছে, যখন গর্ত্তের সাপ বাহির হইয়াছে,

ভালই হইয়াছে, উহাকে লগুড়াঘাতে বিনাশ কর, নতুবা কালে তোমার হঠাৎ প্রাণ বিনাশ করিতে পারে। এমনি হঠাৎ প্রাণ বিনাশ করা রোগই ত কলেরা-বসন্ত। কোথা কিছু নাই, হঠাৎ রোগ দেখা দিয়ে রোগীটিকে নিয়ে গেল। শরীরটা পূর্ব্ব হইতে ব্যাধিক্ষেত্র হইয়া থাকে, তাহাতে কোনরূপে বীজ আসিয়া পড়িলে, কার্য্যকরী হয়; গাছ হইয়া উঠে ও ফলদায়ী হয়। শরীরটা ব্যাধির ক্ষেত্র না হইয়া থাকিলে, বীজে কি করিবে, বীজ শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। পাথরে ফসলের বীজের যে দশা হয়, তাহাই হইবে। ক্ষেত্র বিশেষে বীজ সফলতা লাভ করে, এ জন্য কোন লোকের শরীরে কোন রোগ দেখা দেয়, আবার অন্য লোকের শরীরে, তাহা প্রবেশ করিতে পারে না, কারণ তাহার শরীর সে রোগের উপযোগী ক্ষেত্র নহে।

ক্ষেত্রের ইতর বিশেষত্ব ক্ষেত্রপতির অত্যাচারের অবস্থানুসারে হইয়া থাকে, যাহারা যে শ্রেণীর অত্যাচার করে, তাহাদের সেই শ্রেণীর অসুখই হইয়া থাকে, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ অত্যাচারে বিশেষ বিশেষ রোগ হইয়া থাকে, এক শ্রেণীর অত্যাচারে অন্য শ্রেণীর রোগ হয় না। যাহারা স্নান আহারের অত্যাচার করে, তাহাদের সাধারণতঃ জ্বর, পেটের অসুখ হয়; যাহারা ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করে, তাহাদের কুৎসিত রোগ হয়।

প্রাকৃতিক প্রয়োগ ও নিয়ম পালন করায় রোগী আরোগ্য হইতেছে কি না, তাহা তাহার পরবর্ত্তী শারীরিক অবস্থা হইতে বুঝা যাইবে, তখন তাহার শরীর হাল্‌কা বোধ হইবে, মনে

স্ফূর্ত্তি বোধ হইবে। আর শুধু শারীরিক লক্ষণ হইতে বুঝিতে চেষ্টা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, তাহার কোষ্ঠ পরিস্কৃত হইতেছে; স্বাস্থ্যের পথে অগ্রসর হইবার বেলায় কোষ্ঠের এইরূপ উন্নতি দেখা যাইবে, কোষ্ঠ ত্যাগ কালে কোনরূপ কষ্ট হইবে না, মল একটা আকৃতিবিশিষ্ট হইবে, উহার রং অনেকটা তামাটে এবং ত্যাগের পর উহার শেষাংশ শরীরে লাগিয়া থাকিবে না। আপনারা জানেন কোষ্ঠে গোলযোগ হইলেই অসুখ হয়, আর কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিলে সুস্থ থাকা যায়, সেই জন্যই কোষ্ঠের উদাহরণ দেওয়া হইল।

বিজ্ঞান কথাটা বড় 'ভারিক্কি।' বিজ্ঞান শব্দ শুনিলেই লোকে মনে করে, জিনিষটা কষ্টবোধ্য হইবে, গতিকেই পিছপাও হইতে আরম্ভ করে। বাস্তবিক তাহা নহে, ভাল করিয়া জানার নামই বিজ্ঞান। বিজ্ঞান প্রকৃতির সম্পত্তি। ইহা সকলের জন্যই সমান—ইহার প্রাচ্য প্রতীচ্য নাই; যেমন বিলাতে বসিয়া তিনে তিনে যোগ করিলে ছয় হইবে, এখানে বসিয়া তিনে তিনে যোগ করিলেও সেই ছয়; বিলাতের জন্য সাত, এখানের জন্য পাঁচ, যোগ-ফল হইবে না। আমরা—ইংরাজী শিক্ষিতেরা বলি, আমাদের যত বিধি শাস্ত্রকর্ত্তারা করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিজ্ঞান অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত নহে, উহা কর্ত্তাদের গোঁড়ামী, কিন্তু সেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যদি আমাদের কর্ত্তাদের প্রতিষ্ঠিত বিধিগুলির উপর একে একে ফেলিয়া দেখা যায়, তবে বুঝা যায়, সকলগুলিই বিজ্ঞানসম্মত।

কিন্তু দেশে এত শিক্ষিত লোক আছেন, কেহই এ তথ্যের উদ্ধার করিতে যত্নপর নহেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে উদাসিন নহেন, তাঁহারা যেমন জানিতে পারিলেন, হিন্দুরা উপবাস করিয়া থাকে। অমনিই উপবাসের উপকারিতা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরীক্ষায় উপকারিতা প্রতিপন্ন হইলেই, তাঁহার মত প্রচারিত করিতে লাগিলেন, তখন আমরা বুঝিলাম, উপবাস বিজ্ঞানসম্মত। দই, ঘোল পূর্ব্বে অপকার করিবার ভয়ে খাইতাম না, যেমন Bulgarian Theory বাহির হইল, অমনি দই, ঘোলের শ্রাদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম। কথাটা শুনিতে কানে ঠেকে বটে, কিন্তু অতি সত্য কথা, সাহেবেরা বলিলে, তবে আমরা ভ্রাতাকে ভ্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করি।

আমাদের খাওয়ার যে কয়টা সময় আছে, যতটা পরিমাণ ধরা আছে, যে যে দ্রব্য খাওয়ার প্রথা আছে, তাহা নরচর করিতে আমরা গররাজী। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের অপালন করায়, আমাদের ঐ ঐ সময় ক্ষুধা হয় না, ঐ পরিমাণ খাইতে কষ্ট বোধ করি ও খাদ্য দ্রব্যের অনেক জিনিসে অরুচি হয়, তবুও মামুলী প্রথা নষ্ট হইবার ভয়ে, আমরা জোড় করিয়া সেই সময়, সেই পরিমাণ ও সেই সেই দ্রব্য খাই। তজ্জন্য আমাদের যন্ত্র সকল ক্রমশঃ পীড়াযুক্ত হইয়া পড়ে। পীড়িত যন্ত্রের দ্বারা রীতিমত কাজ হয় না। পূর্ব্বে আমার ফুস্‌ফুসে, যতবার বায়ু গ্রহণ ও নিঃসরণ করিত এবং আমার পাকস্থলী যত সময়ে যে প্রকৃতির যতখানি দ্রব্য পরিপাক করিত, এখন ঐ সকল যন্ত্র তত

পারে না। মানুষের অসুখ হইলে যেমন হয়, আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরও ঠিক তেমনি হয়। তাহারাও কাজ করিতে অপারক হয় এবং আকারে শীর্ণ কিম্বা স্ফীত হইয়া পড়ে। পীড়িত মানুষের ন্যায়, ঐ সকল যন্ত্রকে এই সময় অল্প কর্ম্ম-কিম্বা এককালীন অবকাশ দেওয়া উচিত। খাদ্যের বার ও পরিমাণ কমাইলে এবং লঘু খাদ্য খাইলে, তবে তাহাদের কাজ কম হয় ও উপবাস করিলে, তবে তাহারা এককালীন বিশ্রাম পায়। বিশ্রামের সুখটা আমরা নিজে যতখানি বুঝি, যন্ত্রদের সম্বন্ধে তত বুঝি না, এটা বড় দুঃখের কথা। যিশুখ্রীষ্ট ছয় দিন কর্ম্মের ও এক দিন বিশ্রামের জন্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন, শাস্ত্রকারেরাও বিদ্যার্থীর জন্য কত দিনের অনধ্যায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপ সকল কর্ম্মের বিশ্রাম আছে। আবার কর্ম্ম কঠিন হইলে, তাঁহার বিশ্রামও তদনুরূপ দীর্ঘ ও অধিক উপভোগযোগ্য করা হইয়া থাকে। কিন্তু এ হতভাগ্য দগ্ধোদরের হাজাশুখা নাই, কর্ম্মের লঘুতা ও বিশ্রাম নাই, খাটো—আরও খাটো, দাও—আরও দাও, হজম করিয়া দেও—হজম করিয়া দেও! কত খাটিবে, কত খাইবে, কত হজম করিবে, শেষে একদিন অবসন্ন হইয়া, ভরা গাঙ্গে তরী ডুবাইল।

ব্যাধিযুক্ত লোকের সমস্ত শরীরময় ব্যাধি-মল থাকে; প্রত্যেক যন্ত্রের ভিতর ও বাহিরে, তলপেটে, মাথায়, হাত-পায়ে, শরীরের সকল জায়গায় আছে। তবে তলপেটটাই ব্যাধি-মলের ভাণ্ডারখানা। শরীরের অন্যান্য স্থানে এখান হইতে মল চলাচল

করিয়া থাকে। শরীরের যন্ত্র সকলের ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যাহাকে দুর্ব্বল পায়, সে স্থানে মল দাঁড়াইয়া যায়। যত দিন যায়, তত ঐ দাঁড়ান মল, শিকড় গাড়িয়া স্থায়ী হয়; রংয়ে কাল হয়, তরল মল কঠিন হইতে কঠিনতর হয়, তখন মল স্থানের ব্যাপকতাও হ্রাস হয়। একজন বলে, আমি বুকে মধ্যে মধ্যে বেদনা বোধ করি, আর একজন বলে, আমার ডান উরুর মধ্যে সময় সময় বড় কন্‌কন্ করে, আর একজন কখন কখন ঝাপ্‌সা দেখে। এ তিন জনের যথাক্রমে বুকে, উরুতে, চোখে মল দাঁড়াইয়াছে। তবে, মধ্যে মধ্যে, সময় সময়, কখন কখন এরূপ হয় কেন? সকল সময় হয় না কেন? আহার বিহারাদি কর্ম্মের অত্যাচার ও ব্যতিক্রম যেদিন হয়, সেদিন এরূপ হয়। মনে করুন, নিত্য আপনি এক সের দুধ খান; আজ আপনার ইচ্ছা হইল, দুধ সেরকে জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া খাইতে। ঘন দুগ্ধ গুরুপাক। খাদ্য লঘুপাক হউক, গুরুপাক হউক, উহা পেটে যাইবা মাত্র, আভ্যন্তরিক যন্ত্রেরা উহাকে লইয়া ক্রিয়া করিয়া থাকে। সেই ক্রিয়াতে খাদ্য দ্রব্যের ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটে— খানিকটা জল হয়, খানিকটা রক্ত মাংসের পোষকতা করে; ঐ খাদ্যের রং, আকার, ওজন, সকলের পরিবর্ত্তন ঘটে। যাহা হউক, ঐ খাদ্যের পরিবর্ত্তন কালে বাষ্প সৃষ্ট হয় ও হইবারই কথা, কারণ যন্ত্রেরা সকল সময়েই ক্রিয়াবান, গতিশীল, ঘড়ির কলের মত নড়িতেছে চড়িতেছে; দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রেরা একে অন্যের গা ঘেঁসিয়া আছে, দুই ক্রিয়াশীল যন্ত্র পরস্পর ঘর্ষিত

হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত গতি ও ঘর্ষণে উত্তাপ সৃজিত হইতেছে। গতি ও ঘর্ষণে কেন উত্তাপ সৃজিত হয়, তাহা বুঝাইবার দরকার নাই, কারণ এক দৌড় দৌড়িয়া আসিলে, আপনি গরম বোধ করিবেন, হাতে হাতে ঘর্ষণ করিয়া, দুই হাত পৃথক করিয়া শরীরে লাগাইলে, বুঝিবেন, দুই হাত হইতে গরম ছাড়িতেছে। আভ্যন্তরিক উত্তাপের ভিতর খাদ্য পতিত হইলে, উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্প সৃজন করে, তাহা হয় ত বুঝাইতে পারিলাম। নতুবা আর একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। উনুনের উত্তাপের উপর এক কটাহ বেগুন চড়ান, পূর্ব্বোল্লিখিত পরিবর্ত্তন ও বাষ্প সৃজন, তাহা হইলে, দেখিতে পাইবেন। বেগুন হইতে জল বাহির হইতেছে, বেগুন ক্রমশঃ কাল হইতেছে, স্থান ব্যাপকতা কমিয়া গিয়া অল্প হইয়া দাঁড়াইতেছে; আর বাষ্প ধূমার মত হইয়া বেগুন হইতে উঠিতেছে। সে যাহা হউক, ছড়াইয়া যাওয়া বাষ্পের কাজ, যে দিকে ফাঁক পায়, সে দিক দিয়া বাষ্প পথ লয়। যদি পথে কোন বাধা পায়, তবে যে পদার্থটী বাষ্পের গন্তব্য পথে বাধা দিতেছ, তাহাতে পুনঃপুন বাষ্প ধাক্কা দিয়া থাকে, উপরের বাষ্প ধাক্কা দিল, আবার নীচের বাষ্প উপরে উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত বাষ্পের সঙ্গে মিশিয়া আরোও জোড়ে ধাক্কা দিল, এরূপে ধাক্কাধাক্কি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। বাষ্প সৃজনের কারণ কমিতে আরম্ভ হইলে, ক্রমে বাষ্পও কমিয়া যায়। খাদ্যের লঘু গুরুভেদে বাষ্পের গতি, পরিমাণ, গাঢ়তা (density) ও শক্তির কমি বেশী হইয়া থাকে। আপনার দুগ্ধ

খাওয়াতে যে শ্রেণীর বাষ্প সৃজিত হইয়াছিল, আজ ঘন দুগ্ধ খাওয়ায় তাহা অপেক্ষা কঠিন বাষ্প সৃজিত হইয়াছে। বাষ্পের সহজ কঠিন বুঝা দরকার। রান্না ঘরের ধূমা বাহির হওয়ার চোঙ্গা দিয়া যে ধূম বাহির হয়, তাহাতে হাত দিলে শুধু উত্তাপ লাগিবে, আর এঞ্জিনের চোঙ্গের উপর হাত ধরিলে হাতখানি উড়িয়া যাইবে। লঘুপাক খাদ্যের বাষ্প সহজ বা সহ্যযোগ্য হয়, আর গুরুপাক খাদ্যের বাষ্প কঠিন বা শরীরে পীড়াদায়ক হয়। দুই ইঞ্চি বেড়ের তিন হাত একখানি সোলার লাঠি, আর ঐ মাপের একখানি লোহার লাঠি দিয়া, ধাক্কা কিম্বা আঘাত করিলে, শরীরে কষ্টের যেরূপ তারতম্য হয়, লঘুপাক ও গুরুপাক খাদ্যের বাষ্পের আঘাতেরও সেইরূপ প্রভেদ। যেদিন আপনি গুরুপাক খাদ্য খাইলেন, কিম্বা দৈনিক নিয়মের অপ-ব্যবহার করিলেন, কিম্বা বেশী প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটিল অর্থাৎ গরম কিম্বা ঠাণ্ডা বেশী হইল, সেইদিনই কঠিন বাষ্প সৃজিত হইয়া, আপনার বুকের, উরুর ও চোখের স্থানিক মলে ধাক্কা কিম্বা আঘাত করিতে লাগিল। তাহাতে সময় সময় আপনার নির্দ্দিষ্ট ব্যাধি দেখা দিয়া থাকে।

প্রকৃতি পরিচয়।

প্রধানতঃ প্রকৃতিজাত কতকগুলি পদার্থের দ্বারা চিকিৎসা কার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তজ্জন্য এ চিকিৎসার নাম প্রাকৃতিক চিকিৎসা; জল, সূর্য্য ও অগ্নির তাপ, মৃত্তিকা ও বায়ু, এই চারিটী প্রাকৃতিক পদার্থই চিকিৎসার মূল উপাদান; তদ্ব্যতীত গাছের পাতা প্রভৃতি আরও কোন কোন প্রাকৃতিক পদার্থের সাহায্য লওয়া যায়। আহার ও দিন যাপন বিষয়ে কতকগুলি নিয়ম প্রাকৃতিক চিকিৎসার অনুকূল করিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে ঐ সকল নিয়ম আরোগ্য হইবার পক্ষে অতিশয় দরকারী। প্রাকৃতিক শোভাময় দেশে বাস ও ভ্রমণ ইত্যাদি অনেকানেক পন্থা, এ চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত। সময় ও রোগীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চিত করা যাইতে পারে।

প্রকৃতিকে আমরা চিনি না, কিন্তু আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাঁহারই উপাসক ছিলেন। ধন জন অপেক্ষাও প্রকৃতি তাঁহাদের স্পৃহনীয় ছিল, পর্ব্বত কাননে থাকিয়া, প্রকৃতির সহবাসে, তাঁহারা ইহ পরকালে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি তীর্থ স্থান থাকাতে, এক্ষণেও আমরা প্রকারান্তরে প্রকৃতি সমাগম করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছি। প্রকৃতি জননী স্বরূপিণী। আমরা আহার বিহারের অত্যাচার করিয়া, যে জীবনীশক্তি ক্ষয় করিতেছি ও রোগাক্রান্ত হইতেছি,

তাহা তাঁহার স্তন্য পান করাইয়া শোধরাইয়া লইতে পারেন। প্রকৃতি ব্যতীত মনুষ্যে শুধু ঔষধের দ্বারা তাহা পারে না। অনেকে বলেন, ঔষধে প্রকৃতিকে সাহায্য করে। ইহা তাঁহাদের বৃথা কথা! যিনি সর্বৈশ্বর্য্যময়ী, তাঁহাকে মানুষে কি সাহায্য করিতে পারে? আজকাল সভ্যতার আলোক জগতের উপর যেরূপভাবে পড়িয়াছে, তাহাতে মনুষ্য প্রকৃতি হইতে কেবলই সরিয়া পড়িতেছে; কুইনাইনে জ্বর বন্ধ করিতে পারিলে, একটা উপবাস দিতে চাহে না, একটি প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিলে, যখন তাহার ফল মঙ্গলজনক হইতে দেখা যায়, তখন ইহা নিশ্চয়ই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, শুধু প্রাকৃতিক নিয়মে চলিলে জগত আনন্দের আগার হইত, রোগ শোক থাকিত না। এক্ষণে প্রকৃতি হইতে আমরা এতই দূরে আসিয়াছি যে, সম্পূর্ণরূপে তাহার নিকটস্থ হইবার ক্ষমতা, আর আমাদের নাই, তবুও চেষ্টা করিয়া আমাদের, এক্ষণে সেই প্রাকৃতিক পথ ধরাই উচিত, অবশ্য ইহাতে যথেষ্ট সময় ও অধ্যবসায় ব্যয়িত হইবে। প্রকৃতি যে কে, কিম্বা কি, তাহা আমাদের বুঝাইবার সম্যক ক্ষমতা নাই; গতিকেই বুঝাইতে যাওয়া ধৃষ্টতা। যতখানি বুঝিয়াছি, তাহাই বুঝাইলাম, তারপর পাঠক চিন্তা করিয়া বুঝিয়া লউন। আপনার মাকে যদি আপনি না বুঝিতে পারেন, আমার সাধ্য কি? আমার মাকে তাহার লোকান্তর হওয়ার পর বুঝিয়াছি, তিনি জীবিত থাকিতে বুঝিতে পারি নাই। স্বাস্থ্যের অভাব অর্থাৎ দ্রব্যের অভাব হইলে, তবে তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা

যায়। ব্যাধি হইলে বুঝিলাম; স্বাস্থ্য কি জিনিষ, প্রকৃতি কি, প্রকৃতির বিকৃতিই বা কি? স্বাস্থ্যই প্রকৃতি, প্রকৃতির বিকৃতি ব্যাধি। প্রাকৃতিক গ্রন্থখানির সেই মহান্ রচয়িতা এমনভাবে গ্রন্থখানির রচনা করিয়া রাখিয়াছেন যে, যতই উহা পাঠ করা যাইবে, ততই প্রকৃতি বিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ হইবে। চিকিৎসার অধ্যায় যদি পড়িবেন, তবে আপনাকে প্রাণি-জগতে বিচরণ করিয়া দেখিতে হইবে, প্রকৃতি কেমন করিয়া জীবকে আরোগ্য করিতেছেন। তিনি যে উপায়ে অন্যান্য জীবকে আরোগ্য করেন আপনাকেও সেই উপায়ে মনুষ্যকে আরোগ্য করিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়ম এক—জীবের পক্ষে যা, মনুষ্যের পক্ষেও তা।

প্রকৃতিতে ব্যাধি নাই, প্রকৃতির বিকৃতি হইলেই ব্যাধি। মনুষ্য ব্যতীত অন্যান্য জীব-জগত দেখুন, তাহাতে ব্যাধি অকাল মৃত্যু এককালে নাই। পশু বলুন, পক্ষী বলুন, সরিসৃপ-কীট-পতঙ্গ বলুন, কেহই ব্যাধির দাস নয়, কাহারও মাথা ধরে না, পেটের অসুখ হয় না, সকলেই স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিয়া, কাল পূর্ণ হইলে আনন্দে দেহত্যাগ করে, আর সে দেহত্যাগে যত সুখ, মানুষের ভাগ্যে জীবনকালে তত সুখ হয় কিনা সন্দেহ। মানুষের জ্ঞান আছে যে, তাঁহারা মহাজ্ঞানী জীব। কিন্তু আসুন, পশুর জ্ঞানের সহিত মানুষের জ্ঞানের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। যে জাতীয় জীব যে জিনিষ খায় না, বা যাহা করে না, তাহাকে তাহা খাওয়াইতে কিম্বা করাইতে কোন জীবেরই সাধ্য হইবে না, কিম্বা সে নিজে হইতে জাতীয় নিয়মের

ব্যত্যয় করিবে না, আপনার প্রকৃতিতে আপনি স্থির থাকিবে। আর একজন মানুষ তাহার চৌদ্দ পুরুষে যাহা খায় নাই বা করে নাই এবং তাহা খাইলে বা করিলে পাপ করা হইবে, এ জ্ঞান সত্ত্বেও, সে হয় অনুরোধে, নয় প্রলোভনে, তাহা খাইতে কিম্বা করিতে পারে। ইহা হইতে, আপনারা কাহার জ্ঞানের উৎকর্ষ দেখিলেন? মানুষের পিছু পিছু ব্যাধিরূপী সয়তান ফিরিতেছে, একটু জ্ঞানে কম দেখিলেই, সয়তান মানুষকে প্রাকৃতিক পথ হইতে বিচ্যুত হইবার পরামর্শ দেয়। মনুষ্য তাহাতেই ভুলে। যে কেহ ব্যাধি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, তাঁহাকে আমরা সতত জ্ঞানকে জাগরূক রাখিবার পরামর্শ দেই। দিবা রাত্র ভাল মন্দ অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া কার্য্য করিতে হইবে। ভাল মন্দ চিকিৎসাকে একবার কি দুইবার বলিয়া দিতে পারে। আর সমস্ত বিষয়ের ভাল মন্দ চিকিৎসক বলিয়া দিতে, সকল সময় সক্ষম হইবে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। যে সকল রোগী নিতান্ত ব্যাধি-বিহ্বল কিম্বা অল্প বয়স্ক, তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে একজন জ্ঞানযুক্ত মনুষ্য থাকা উচিত। সে-ই তাহাদের পক্ষে কি ভাল, কি মন্দ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাইবে। শরীরে ব্যাধি আনা মানুষের পক্ষে সহজসাধ্য। বড় কঠোর না করিলে, ব্যাধি দেহ হইতে বাসা তুলিতে চায় না। এই মানুষের আদিতে কোন ব্যাধিই ছিল না। এক্ষণে সয়তানের কুহকে, ব্যাধি ভিন্ন জীব জগতে দুর্ল্লভ হইয়াছে। শরীরং ব্যাধি মন্দিরং।

সেণ্টপল বলেন "The good, that I would, I do

not, but the evil, which I would not, that I do." মানুষ বেশ জানে, রাত্রিকাল ঘুমাইয়ার সময়, জীব-জগত গভীর নিদ্রায় মগ্ন, এমন কি, উদ্ভিজ্জগতও শাখা শ্লথ করিয়া নিদ্রাভিভূত; সেই সময় পার্লামেণ্ট মহা সভা হয়! নিমন্ত্রণের বার আনা খাইতেই উদর পূর্ণ, ক্ষণিক সুখের জন্য, অবশিষ্ট সিকি গলাধঃকরণ করিতেই হইবে, তখনই আমাদের শারীরিক পাপ জন্মিল, ঐ পাপের শাস্তিই ব্যাধি-ভোগ। পাপের মাত্রা কিম্বা প্রাকৃতিক নিয়মের অপালন যে পরিমাণ আমরা করিব, ব্যাধি ভোগের কাল ও ব্যাধির যাতনা আমাদের তদনুরূপ হইবে। ব্যাধির সময়ও প্রকৃতি আমাদের ব্যাধি আরোগ্যের জন্য যথেষ্ট করেন। কিন্তু সকল কার্য্যেরই একটা সীমা আছে। যখন আমাদের ব্যাধির পরিমাণ, আরোগ্যকারী ক্ষমতার অপেক্ষা অধিক হয়, তখনই মানুষের মৃত্যু হয়। ঐ আরোগ্যকারী ক্ষমতার অন্য নাম জীবনী-শক্তি।

ব্যাধি জিনিষটা মানুষের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তি। প্রাকৃতিক নিয়মে যত দিন মনুষ্য চলিয়াছিল, তত দিন ব্যাধির সৃষ্টি হয় নাই, প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করাতে জগতে ব্যাধি দেখা দিল। অন্যান্য জীবে প্রাকৃতিক নিয়মের অপব্যবহার শীঘ্র করিতে চাহে না, তজ্জন্য তাঁহাদের ব্যাধিও শীঘ্র হয় না। মনুষ্যের দ্বারা তাহাদের শরীরে ব্যাধিবীজ প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে সকল জীব মনুষ্যের সহবাসে থাকে, তাহারাই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছে। যাহারা মনুষ্য হইতে দূরে আছে, তাহারাই ভাল আছে। গরু,

ছাগল, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি কতকগুলি জীবের লোকালয়ই একমাত্র বাসস্থান। মনুষ্য তাহাদিগকে ব্যাধি উৎপাদক খাদ্য খাওয়ায়, ব্যাধি হইতে পারে, এমন ভাবে রাখে, এই জন্য তাহাদের মধ্যে ব্যাধি হইতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল জীব আরোগ্য হইবার প্রক্রিয়াও জ্ঞাত আছে. কুকুরে উপবাস দেয়, বিড়ালে কাঁচা ঘাস খাইয়া উদরস্থ দূষিত খাদ্য উদ্গীর্ণ করে। কিন্তু মানুষের বিজ্ঞানের এ সকল দেখিয়া শুনিয়াও রাত্রে ঘুম হয় না, তাহারা পশু চিকিৎসার জন্য কত রকমই না বীভৎস ঔষধ ও প্রক্রিয়ার আবিষ্কার করিতেছে। দেশে গাছ গাছ্ড়ার টোট্কা দিয়া, যে সকল পশু চিকিৎসার প্রথা ছিল, তাহাও লোকে ভুলিয়া যাইতে চলিয়াছে, কিম্বা অত ভেজালে না গিয়া ডাক্তারী ঔষধই ব্যবহার করিতেছে। কথা আছে, গরু পুষিতে হইলে গরু হইতে হয়, তবে গরুর দুখ দরদ জানা যায়।

মানুষ যে স্থানে থাকে, তথাকার মাটি ব্যাধি-রসে আর্দ্র হয়; মানুষের মাথার উপরের আকাশে ব্যাধি-কীটাণু ঘুরিয়া বেড়ায়। সেইজন্য মানুষের নিকটস্থ জীব সকল ব্যাধি আক্রান্ত হইয়া থাকে। এমন কি, তথাকার উদ্ভিদেরাও ব্যাধি স্পৃষ্ট, তাহারা উচিত মত ফুল ফল দেয় না, কেহ জীর্ণ শীর্ণ, কেহ বা কীটদষ্ট পত্র শাখ। সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, মানুষ আপনার পায়ে, আপনি কুঠার মারিতেছে। মানুষ ব্যাধি-শত্রুকে ডাকিয়া আনিতেছে!

যে ব্যক্তির যেরূপ প্রকৃতি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবন পরিচাল-

নের রীতি, তাহার বিকৃতি অর্থাৎ ব্যতিক্রম হইলেই ব্যাধির কারণ হয়। এক ব্যক্তির দিবা নিদ্রা অভ্যাস নাই, সে যদি দিনে ঘুমায়, তবেই তাহার প্রকৃতিগত নিয়মের ব্যতিক্রম হইল, তখনই ব্যাধি আসিয়া তাহার শরীরে স্থান লইল। ন দিবা শাপ্সি। জগত কর্ম্মের স্থান, ভানুমান ও দিবালোক জীব-জগতকে কর্ম্মের জন্য সতত আহ্বান করিতেছেন। প্রকৃতির এ আহ্বানকে কখন কেহ যেন অবহেলা না করেন, প্রকৃতির রজনী-চারী জীবগুলির অনুকরণ মানুষ যেন না করেন ; ঐ সকল জীব প্রকৃতির কি উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, তাহা বিবেচনাসাপেক্ষ।

ব্যাধি-বীজ শরীরে পড়িলে, তাহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা প্রথম হইতেই করা উচিত। নতুবা ঐ বীজ কালে শাখা প্রশাখা লইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। স্নায়ুমণ্ডল (nervous system) আহত হইলেই শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিতে থাকে। স্নায়ুমণ্ডল অসংখ্য কারণে আহত হইয়া থাকে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আঘাত আমাদের স্নায়ুমণ্ডলে প্রবিষ্ট হয়। স্নায়ুমণ্ডল হইতে ঐ আঘাতের ফল, ব্যাধি-পদার্থরূপে শরীরে দেখা দেয়। ব্যাধি পদার্থই ভাবী ব্যাধির জনক। মনে করুন, নাসিকা দিয়া মলের দুর্ঘাণ, কি আইডোফরমের তীব্র ঘ্রাণ আপনার শরীরে প্রবেশ করিয়া, আপনার স্নায়ুকে আলোড়িত করিল, ঐ ঘ্রাণই আপনার ভবিষ্যত ব্যাধির কারণ হয়। মুখ গহ্বর দিয়া ত কত রকম ব্যাধি-বীজ প্রবেশ করিতেছে, তাহার উল্লেখ করা বাহুল্য। প্রত্যেকের শরীরের সকল বিষয়েই একটা মাত্রা বাঁধা আছে. ঐ

মাত্রার এদিক ওদিক হইলেই ব্যাধির কারণ হয়। আপনি তরকারীতে যে পরিমাণ নুন খান, তাহার বেশী হইয়া তরকারীটি নুনে পুড়িলে, আপনার স্নায়ুমণ্ডলে আঘাত পড়িবে, আবার আলুণে হইলেও আপনার কষ্টবোধ হইবে, কষ্টেও স্নায়ুমণ্ডল আহত হয়। তাই বলি, আপনার প্রকৃতিতে আপনাকে স্থির থাকিতে হইবে। বেশী অগ্রপশ্চাৎ হইতে পারিবেন না। দেখিলেন, নুণে পোড়া খাইলে, কিম্বা আলুণে খাইলে আপনার ব্যাধি হইল, কিন্তু নুণে পোড়া, কিম্বা আলুণে খাওয়া যাহার অভ্যাস, তাহার কিছুই হইল না। কারণ তাহার প্রকৃতিই ঐরূপ, উহা তাহাদের প্রকৃতির বিকৃতি নহে। ব্যক্তিগত প্রকৃতি বিভিন্নরূপ হইতে পারে, কিন্তু দ্রব্যের গুণ একরূপই হয়।

স্নায়বিক আঘাতের লঘুত্ব ও গুরুতা অনুসারে ব্যাধির তারতম্য হয়। ব্যাধি যত দীর্ঘকাল শরীরে স্থায়ী হয়, ততই ব্যাধি সারাইতে অধিক সময় লাগে। যখনই স্নায়ুমণ্ডল আহত হইল, তখনই শরীর ব্যাধির কারণ, কিম্বা ব্যাধিক্ষেত্র হইল। কিন্তু যাহার শরীর, সে তখন কিছুই বুঝিতে পারিল না। তারপর প্রাকৃতিক শক্তির সহিত যখনই তাহার শরীরস্থ ব্যাধি-পদার্থের সংমিশ্রণ হইল, তখনই জ্বর কি কফ ইত্যাদি রোগ বাহিরে দেখা দিল। তখন যে রোগ হইয়াছে, তাহা রোগী ও অন্যান্য লোকে বুঝিল, এই শক্তির ক্রিয়ার নামই রোগ। আপনি বলিবেন, আজ আপনার জ্বর হইয়াছে। আমি বলিব, আপনার জ্বরের কারণ যেদিন হইতে হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আপনার

জ্বর হইয়াছে, সেইদিন হইতেই আপনার শরীর ভার, কি এক অব্যক্ত যাতনায় সেইদিন হইতেই আপনি ভুগিতেছেন, আজ আপনার জ্বর হয় নাই, আজ আপনার জ্বর-নির্গম হইয়া আপনার ভবিষ্যত মঙ্গল হইতেছে। এইরূপে সকল ব্যাধিতেই আমরা সেই সেই ব্যাধি হইতে রোগী মুক্ত হইতেছে, এইরূপ বলিয়া থাকি। আপনি বলিবেন, তেঁতুল খাওয়ায় আপনার জ্বর হইয়াছে, আমি বলিব, রাম, হরি, কালী ও আপনি চারি জনে এক সময়ে, এক গাছের তেঁতুল খাইলেন, তাহাদের তিন জন বেশ আছে, আর আপনি জ্বরে পড়িলেন। তেঁতুলে যদি জ্বর থাকিত, তবে তাহাদেরও জ্বর হইত। তেঁতুল জ্বরের কারণ নয়। আপনার ব্যাধিগত শরীর তেঁতুল রূপ প্রাকৃতিক বস্তুর সংমিশ্রণে আসাতে, জ্বর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহা হইলে, আপনার শরীরই জ্বরের কারণ।

আপনার দেহের স্নায়বিক স্রোতকে নদীর ধারার মত বহিয়া যাইতে দিউন। ঐ স্রোতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য যথেচ্ছ অপচার করিয়া, উহার জল আন্দোলিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবেন না। সতত ধীর জ্ঞানে প্রতি মুহূর্ত্তে কার্য্য সাধন করুন। তাহাতে সুস্থ থাকিবেন ও ব্যাধিমুক্ত হইবেন।

শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিলেই, শরীরের স্বাভাবিক লাবণ্য নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। শরীর কদাকার ও কৃষ্ণবর্ণ হইলেও, শরীরে যদি স্বাস্থ্য থাকে, তবে চেহারা দেখিতে ভাল লাগিবে। কেন কালার রূপে কত রমণী ভুলিয়াছিল, তাহা কি আপনারা

জানেন না! স্বাস্থ্যেই সৌন্দর্য্য। বৃদ্ধ হউক, যুবা হউক, যাহার স্বাস্থ্য আছে, সেই সুন্দর। আর স্বাস্থ্যহীন যুবকও দৃষ্টিকটু, শরীরে ব্যাধি-পদার্থ হইলে, শরীরের সমতা নষ্ট হইয়া যায়। মাপিয়া দেখিলে, ডান হাতের বেড় অপেক্ষা, বাম হাতের বেড় বড় হইবে, বা বাঁ গাল ডান গাল অপেক্ষা কিছু ফোলা ফোলা, ইত্যাদি অসামঞ্জস্য শরীরে পরিলক্ষিত হইবে।

একদিনে ব্যাধি-পদার্থ একজনের দেহে জমে না। ব্যাধি-পদার্থ কেহ বা পিতা মাতা হইতে প্রাপ্ত হয়, কেহ বা বৎসরের পর বৎসর অত্যাচার করিয়া উপার্জ্জন করে। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মে, রোগী যে কাত হইয়া শোয়, সেই দিকে স্বভাবতঃ ব্যাধি-পদার্থ জমিবে। যে রোগী ডান কাতে শুইবে, তাহার দক্ষিণ গণ্ড, দক্ষিণ বক্ষঃ, দক্ষিণ উরুঃ ব্যাধি-ভারাক্রান্ত হইবে; সেই স্থানে ও সেই দিকের আভ্যন্তরিন যন্ত্রের পীড়া হইবে! যেমন ডান কাতে শোওয়া রোগীর যকৃতের অসুখ হইতে পারে। শরীরে ব্যাধি-পদার্থ জমিলে বোধ হইবে, 'এ দেহ আপন নয়।' তখন কোষ্ঠকাঠিন্য, কিম্বা পেটের অসুখ হইবে, গায়ের ত্বক শুষ্ক দেখাইবে, আমি যাহা চাহি না, এরূপ সকল লক্ষণ পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাধি-পদার্থ শরীরের অংশ নয়, বা যন্ত্র নয়, উহা অবান্তর জিনিস। উহার থাকিবার কেন্দ্রস্থান তলপেট। তলপেট হইতে উহা সর্ব্ব শরীরে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন পায়ের গিঁঠে যাইয়া, গিঁঠে বাত হইতেছে, কখন মাথায় উঠিয়া আমাদিগকে আধ-কপালীর যন্ত্রনায় অস্থির করিয়া তুলিতেছে।

যতদিন রোগ প্রবল থাকে, ততদিন রোগীকে কোন ভাবনা চিন্তা ও পড়া শুনা ও সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে দিতে নাই। রোগীর মন ও শরীর স্বতঃ নানারূপ কষ্টে বিব্রত থাকে, তাহার উপর ঐ সকল করিতে দিলে আরও বিব্রত হইবে। রোগীর মন যাহাতে নিশ্চিন্ত ও কর্ম্ম হইতে দূরে থাকে, তাহাই করিতে হয়। নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চিন্ত যে সময় মানুষ হয়, সেই সময় তাহার রোগ আরোগ্য হইবার সময়। মানুষের এই সময়ে, তাহার অভ্যন্তরস্থ প্রকৃতি বেশী কাজ করিয়া থাকে, ইহা আপনারা তাঁহার রাত্রির কার্য্য দেখিয়া পরিচয় পাইয়া থাকেন। সমস্ত রাত্রি তিনি মানুষের দেহ-মল বাহির করিয়া পরিস্কার করিয়া দেন, তাই মানুষ সকাল বেলায় নূতন হইয়া জগতে বাহির হয়। চোখ, নাক ইত্যাদি দিয়া দিনে ঐরূপ মলীয় রেচন হয় না।

আপনারা চিকিৎসা জগতকে আপনাদের হইতে যত দূর বিবেচনা করেন, বস্তুতঃ তাহা নহে; আগে আপনাদের বাটীর কর্ত্তাগিন্নি সাধারণ রোগের উপদেষ্টা ও চিকিৎসক ছিলেন, তাহাতে বেশ কাজ হইত, এখন কিছু হইবামাত্র আপনারা বাহির পানে ছুটেন, ধৈর্য্য ও বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেন না। মেয়েলী ও শিশুরোগে, বাড়ী কি পাড়ার মধ্যে যিনি বয়স্থা থাকিতেন, তিনিই যা বলিতেন, তাহাই ধ্রুবসত্য বলিয়া মানা হইত, ইহা আমরাই বাল্যকালে দেখিয়াছি, আর ফল হইত বলিয়া ইহাঁদের কথার এত আদর ছিল। এক্ষণে, কঠিন পীড়া হইলে, রোগীর শরীরে কি অত্যাচারই হয়। শুধু কতকগুলি বেশী তদ্বিরে ফল

হয় না, ঠিক তদ্বির অল্প হইলেই হইল, তা অত ছুটাছুটি করিয়া করিলে হয় না, ধীরতার সহিত কার্য্য সাধিত করিতে হয়। “হাঁই পাঁই করিও না ‘শরীরের ক্ষয়’, অল্পেতেই অধিক হয়।”

অধ্যাত্ম-তত্ত্বই জগতের মূলতত্ত্ব। ভগবানের নিকট রোগীর মঙ্গল কামনা করিয়া, প্রার্থনাদি করা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। ভারত ধর্ম্ম কার্য্যের অগ্রণী, ভাল হউক, মন্দ হউক, সকল সময়ে ভগবানের পাদমূলে উপস্থিত হওয়া কর্ত্তব্য, প্রার্থনায় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া, ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহারই করুণাকে জগতের শ্রেষ্ঠ জিনিষ বলিয়া বুঝিয়াছেন; যখন মানুষের ক্ষমতার বাহিরে গিয়া রোগী পড়ে, তখন সেই ভবরোগ নিবারণ পতিতপাবন দয়াময়কে ডাকিয়া, কত রোগী যে নিরাময় হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আমাদের মনে হয়, ছোট বড় সকল রোগেই তাঁহারই চরণ সমীপে গিয়া উপস্থিত হওয়া উচিত, তিনি সঙ্কটাপন্ন অবস্থা হইতে রোগীকে আরোগ্য করিয়া থাকেন, তবে সামান্য জ্বরাদিতে তিনি কি অপারক হইবেন? সুখের সময় তাঁহাকে আমাদের মনে পড়ে না, শোকে দুঃখে দেখা দেন, তাই আমাদের মনে হয়, এ সময় তাঁহারই দরকার হইয়াছে। আমরা যে প্রকৃতি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি, দেখিতে গেলে, তিনিই সেই প্রকৃতি। আমাদের মানস নয়ন খুলিয়া যাউক, আমাদের অন্ধত্ব ঘুচিয়া যাউক, আমরা যেন দিব্য দেখিতে পাই, সেই পরমা প্রকৃতি আমাদের জীবনের সার, সুখে দুঃখে যেন তাঁরই পাদমূলে থাকিতে পাই,

জীবনের শেষে, তাঁরই চরণে মাথা রাখিয়া চরণের ধূলিসনে বিলীন হইয়া যাই।

*　　*　　*　　*

আমাদের কোন সমিতি নাই; আমাদের স্নানাগার নাই, পাঠাগার নাই; বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাগার নাই; প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব প্রভৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য বাহিরে যাইবার সময় নাই; আমাদের কিছুই নাই, আছে কেবল মন,—বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসেই আমরা হাল ছাড়িতেছি না। ভাবিতেছি 'আজ না হইতে পারে, হ'তে পারে কাল।' On faith our breath, On faith our death.

জর্ম্মণী, ইংলণ্ড ইত্যাদি স্থানে যে সকল মহাত্মা প্রাকৃতিক চিকিৎসার পিতৃস্থানীয় হইয়া গিয়াছেন; তাঁহারা প্রায়শঃ সাধারণ ব্যক্তি; চিকিৎসকও নহেন, বিজ্ঞানবিদও নহেন; নিজেরা রোগ ভুগিয়া ডাক্তারের দ্বারা যখন কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়াছেন, তখনই চিন্তা করিয়াছেন আত্ম-নির্ভরতা দ্বারা কতখানি আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে এবং সেই চি কার্য্যে পরিণত করিয়া বৎসরের পর বৎসর কেবল কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সামাজিক ও আর্থিক ও পারিবারিক ক্ষতির দিকে দৃকপাত করিবার অবসরও ঘটে নাই। এইরূপ এক এক মহাত্মার উদ্যমের ফলস্বরূপ এক এক রকম প্রাকৃতিক চিকিৎসা পদ্ধতি। আর সে দেশের লোক নূতনের পক্ষসমর্থণ করিয়া, নব প্রসূত শিশু পালন করিয়া, তদ্দারা সময়ে কার্য্য

় করিয়া লইতেছে। এক একজন আবিষ্কর্তার পুস্তক ৮।১০ ৎসরের মধ্যে ২০।২৫ ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রত্যেক ভাষার পুস্তকের ৪০।৫০ সংস্করণ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এ সকল ভারতবাসীর পক্ষে কল্পনার কথা! ইয়োরোপ ও আমেরিকার তুলনায় 'ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।' ব্যাধি-জীব একবার দেখিয়া তুলুন, ঐ সকল দেশে কতগুলি বিনা ঔষধের চিকিৎসালয় চলিতেছে, কত বিদ্বানে, ধনবানে, তাহাতে চিকিৎসিত হইতেছে; এ দেশে চিকিৎসাগার আছে, তাহাতে ইয়োরোপিয়েরা চিকিৎসিত হইয়া থাকে মাত্র। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় যে সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা পুস্তকে ও কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য দেখাইয়াছে যে, পৃথিবীতে উপস্থিতে আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্র, তাহা পারিতেছে না, সুবিচার হইলে, ইহা নিশ্চিত সপ্রমাণ হইবে। তাই স্বদেশবাসীকে বলি, আপনারা একবার প্রাকৃতিক চিকিৎসার পরীক্ষা করুন। আমাদের আদিপুরুষগণ প্রাকৃতিক চিকিৎসারই পক্ষপাতী ছিলেন।

যাঁহার পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই কুয়ানকে আচার্য্য-দেব বলিয়া জানি কোয়ানের প্রবর্ত্তিত চিকিৎসা-পদ্ধতি আবিষ্কার করিতে, তাঁহার ত্রিংশ বৎসর সময় লাগিয়াছিল; এত কাল দৈর্য্যধারণ করিয়া থাকা সাধারণ লোকের কাজ নহে। অধ্যাপক কুয়ানকে কত গ্লানি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ সহ্য করিয়া, কত কুতর্কের উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়া, তাঁহার স্বমতে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে হইয়াছিল। এখন লোকে

বুঝিয়াছে, তাই সহস্র সহস্র লোকে তাঁহার মতে চিকি
হইয়া নিরাময় হইতেছে, সহস্র সহস্র পাঠকে তাঁহার গ্রন্থ
পাঠ করিয়া দেহজ্ঞান লাভ করিতেছে। কুয়ানের
আবিষ্কার ভাবী-ব্যাধিনিরূপণ (progrosis) শাস্ত্র।
ষ্যতে যে ব্যাধি হইবে, শরীর দেখিয়া তাহাই পূর্ব্বাহ্ণে ব
দিতে, এ শাস্ত্র সক্ষম। অবশ্য শুধু শাস্ত্র পাঠে কিছু নির্ণয়
যায় না, শাস্ত্র লিখিত বিষয়ের অনুশীলন চাই শ
বাহিরের জাঁক জমকে অনেকে ভুলেন, কিন্তু ভিতরে মৃত্যু
যে জাল বুনিতেছে, তাহা এই শাস্ত্র ধরাইয়া দিতে পারে।

অধ্যাপকের মতের সহিত বাহ্যতঃ কোন কোন স্থলে
দের মত মিলে নাই। তাঁহার লিখিত বিষয়ে, কোন
আমরা ফল পাইয়াছি, কোন স্থলে পাই নাই। যে গুলি
ফল পাইয়াছি, তাহাই লিখিত হইল। ইহার কারণ, স্থান
পাত্র ভেদে, জল বায়ু ও আহার বিহারের রীতিনীতি পৃথ
হওয়ায়, এ দেশের অনুরূপ করিয়া কতকগুলি মত পরিব
করিয়া লওয়া হইয়াছে ও কতকগুলি একবারীন বর্জ্জন
হইয়াছে। ফল কথা, বাহিরে বিভিন্নতা থাকিলেও, মূল
একই। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন নূতন বিষয় আমাদের মা
উদয় হওয়ায় আমরা পরীক্ষা দ্বারা তাহার যাথার্থ্য উপল
করিয়া, তাহা গ্রহণ করিয়াছি। এই সত্যগুলি শাস্ত্র
শীলনের ফলে আপনিই বাহির হইয়া পড়ে। ইহাকে আবি
ষ্কার বলিলে বাক্যাড়ম্বর করা হইবে।